ড. মুস্তফা সিবাঈ

ওরিয়েন্টালিজমের প্রথম পাঠ

ভাষান্তর
কামরুল হাসান নকীব

উৎসর্গনামা

সুদূর ও অদূরের যত সত্যনিষ্ঠ আগত ও বিগতজন রয়েছেন
তাঁদের শুভকামনায়...

To these ideas was added second-order Darwinism, which seemed to accentuate the "scientific" validity of the division of races into advanced and backward, or European-Aryan and Oriental-African.

অর্থাৎ,

এজাতীয় চিন্তায় দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করে ডারউইনিজম বা বিবর্তনবাদ, যা মানুষের মাঝে জাতিগত ভেদবুদ্ধির "বৈজ্ঞানিক" বৈধতাকে বাহ্যত সুদৃঢ় করে। মানবজাতি বিভাজিত হয়ে পড়ে উন্নত-অনুন্নত মানুষে অথবা আর্য-ইউরোপিয়ান এবং প্রাচ্যীয়-আফ্রিকান মানুষে।

[Edward W. Said, Orientalism, p. 206]

সূচিনামা

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

সব লেখকের জন্যই নিজ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ অনন্য আনন্দ বয়ে আনে। বর্তমান সংস্করণটি *হোয়াইট লেটারস পাবলিকেশন্স* ও *মুভমেন্ট পাবলিকেশন্সের* যৌথ প্রকাশনা। এবার পূর্বেকার সংস্করণের কিছু বিষয় ও বাক্যকে মূলানুগভাবে সরল ও সহজ করা হয়েছে প্রাথমিক পাঠকদের কথা বিবেচনা করে। গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু টীকা যুক্ত হয়েছে। আরব লেখকদের স্বভাব হলো, তারা ভিনভাষার সংগঠন, পত্রিকা ও বই ইত্যাদির নাম আরবিতে ভাষান্তর করে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে আরবি থেকে যারা অনুবাদ করেন তাদের জন্য মূল নাম বের করে আনা খুব কষ্টসাধ্য। আমরা এবার বাংলার সাথে মূল লেখকের সেই আরবি ভাষান্তরকেও উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। কিছু স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবি ভাষান্তর উল্লেখ করা হয়নি। আবার কিছু স্থানে মূল ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান নামও উদ্ধার করে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। আশা করছি পাঠক বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও সাদরে গ্রহণ করবেন।

কামরুল হাসান নকীব
হাছানিয়া কমপ্লেক্স, পূর্ব বাড্ডা
১৮ মার্চ, ২০২১

ভূমিকা

ভূমিকার শুরুটা করতে চাই একটি প্রশ্ন দিয়ে। ওরিয়েন্টালিজম শব্দটি কি প্রাচ্য সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কাজ করেছেন তাঁদের কাজকে বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা উচিত? নাকি যারা প্রাচ্যের ওপর ইতিবাচক কাজ করেছেন তাঁদের কাজকে বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের রচনাবলিতে অথবা প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচকদের বিশাল কর্মভাণ্ডার থেকে আমাদের পাওয়া খুবই মুশকিল। সাধারণত প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রাচ্যসম্পর্কিত যাবতীয় কাজকেই প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ ও প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচকগণ 'প্রাচ্যবিদ্যা' বলে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এমনতর কাজের ব্যাপারে আজ সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা, তারা- প্রাচ্যের কুৎসা রটনা করাই যাদের পরম ধর্ম ছিল কিংবা প্রাচ্যের বিপক্ষে যারা কাজ করেছেন তাদের গায়ে যেমন প্রাচ্যবিদ তকমাটি এঁটে দিয়েছেন, তদ্রূপভাবে যারা প্রাচ্য সম্পর্কে নিখাদ বস্তুনিষ্ঠ কাজ করেছেন তাঁদের গায়েও লাগিয়ে দিয়েছেন 'প্রাচ্যবিদ' নামক তকমাটি। এতে করে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তাঁদের গুণগ্রাহীদের পাশাপাশি প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচকরাও প্রাচ্যতত্ত্বের কিছুটা সহযোগিতা করেছেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

বস্তুত আমরা ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সর্বোপরি যে কোনো মতবাদের পক্ষের এবং বিপক্ষের লোকদের কখনই একই অভিধায় স্মরণ করি না। যাতে করে শত্রু ও মিত্রের মধ্যকার যৌক্তিক বিভেদ রেখাটি সবার সামনে স্পষ্ট থাকে। তাহলে প্রাচ্যবিষয়ক বিদ্যার বেলায় কেন ভিন্ননীতি? তাই আমাদের এমন একটি শব্দের তালাশ করতে হবে যা তথাকথিত প্রাচ্যবিষয়ক গবেষকদের প্রকৃত চরিত্র ধারণ করে। এক্ষেত্রে অনেকেই প্রাচ্যবিদ্যা নামক শব্দটির প্রস্তাব করে থাকেন। তবে আমরা প্রাচ্যবিদ্যা শব্দটি ঢালাওভাবে প্রাচ্যসংশ্লিষ্ট সকল কাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করার পক্ষপাতী নই। কারণ এতে প্রাচ্য বিষয় নেতিবাচক কাজ যারা করেছেন তাদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা হয় না। এতে প্রাচ্যের ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তত্ত্ব আরোপ করে তাদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক হয়ে ওঠার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে প্রাচ্যতত্ত্ব শব্দটির কথা বিবেচনায় নেয়া যায়। ওরিয়েন্টালিজমের ইজম শব্দটির যদিও বাংলা 'বাদ' শব্দটির সাথে সখ্য বেশি কিংবা আরবি ইস্তিশরাকের সাথে প্রাচ্যবাদের মিল বেশি, তথাপি এগুলো ওরিয়েন্টালিজমের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করতে অক্ষম। তাই একে প্রাচ্যতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত।

দুই.

১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'ওরিয়েন্টালিজম' প্রকাশ করে প্রাচ্যসম্পর্কিত সারা পৃথিবীর সাধারণ ও বিশেষজ্ঞজনদের চিরাচরিত বিশ্বাসকে পুনর্পাঠে বাধ্য করে তোলেন। বিশেষ করে সমগ্র পশ্চিমে প্রাচ্যের পক্ষ হয়ে অনেকটা এককভাবেই পশ্চিমের বিপক্ষে ওকালতি করা শুরু করেন। পশ্চিমের আধিপত্যবাদী মানসিকতার ওপর নিরপেক্ষ আলোকপাত করে পশ্চিমকে করে তোলেন বিপন্ন ও বিব্রত। বিদ্বৎসমাজে শুরু হয় এর পক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল তর্ক। পশ্চিমের কেউ কেউ ওরিয়েন্টালিজমের আলোয় নিজ মুখাকৃতি দেখে আঁতকে ওঠেন। কেউ আবার আশ্বস্তবোধ করেন। পশ্চিমের চিন্তাজগতের গতিমুখে নতুন মোড়ের সূচনা পরিলক্ষিত হতে থাকে। পশ্চিমের ঔপনিবেশিক মনোজগতে সৃষ্টি হয় সুবিন্যস্ত বিপর্যয়। অনেকে আবার প্রাচ্যতাত্ত্বিক তকমাটি গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য উদ্যত হন। নতুন নাম গ্রহণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।[১]

বলাবাহুল্য, প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনার বিশাল এ কর্মক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সাঈদই একমাত্র এবং প্রথম ব্যক্তি নন, যিনি প্রাচ্যের হয়ে কথা বলেছেন কিংবা প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের একদেশদর্শিতা ও চিন্তা-চেতনার সীমাবদ্ধতাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাঈদের পূর্বেকার আরও অনেক পূর্বাচার্যের দেখা আমরা পাই। যাদের ভাষা সাঈদের চেয়েও প্রাঞ্জল ও লক্ষ্যভেদী। যাদের বক্তব্য আরও তীক্ষ্ণ ও তীব্র। যাদের যুক্তির ধার সাঈদের চেয়ে দীপ্র ও ক্ষীপ্র। প্রাচ্যের বহু চিন্তাবিদ এক্ষেত্রে সাঈদের পূর্বসূরি ছিলেন। তাদের মধ্যে ড. মুস্তফা সিবাঈ অগ্রগণ্য। যিনি ছিলেন একাধারে একজন অনন্য সাহিত্যিক, অভিজ্ঞ আইনবেত্তা, বিদগ্ধ অধ্যাপক ও বিচক্ষণ সাংগঠনিক। তবে এডওয়ার্ড সাঈদের বিশ্বজোড়া খ্যাতির পেছনে কারণ হলো– সাঈদ পশ্চিমের অন্যতম প্রধান ভাষায় এবং পশ্চিমের দর্শনের আদলে তাদের প্রতিপক্ষতা করেছেন। উপরন্তু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় (যুক্তরাষ্ট্রের

[১] Albert Hourani wrote me in March 1992, a few months before his untimely and much regretted death, due to the force of my argument (for which he said he could not reproach me), my book had the unfortunate effect of making it almost impossible to use the term "Orientalism" in a neutral sense, so much had it become a term of abuse. He concluded that he would have still liked to retain the word for use in describing "a limited, rather dull but valid discipline of scholarship."- Edward W. Said , Orientalism, page 340 .

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনাসহ যুক্তরাষ্ট্রের এবং কানাডা ও ইংল্যান্ডের বহু ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্ব পালন করেন) তাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। এক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর ধর্মপরিচয়কেও (খৃস্টান) অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন তাহলে আমরা তাঁর প্রতিবাদ করব না। (কেননা তাঁর বইটি মূলত ছিল নিকট প্রাচ্যের ধর্ম ইসলাম ও তার অনুসারীদের ওপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক অপপ্রচারের প্রত্যুত্তর। যা একটু পরে আমরা তাঁর নিজ মুখেই শুনবো। তাই একজন খৃস্টান হয়েও প্রাচ্যের প্রধান ধর্ম ইসলামের পক্ষপাত করাটা কৌতূহল উদ্দীপক বৈকি) এর পাশাপাশি নোয়াম চমস্কির মতো পাশ্চাত্যের সর্বজনবিদিত তীক্ষ্ণধী ভাষাবিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা তাঁর পাশে দাঁড়ানোয় তিনি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের সুদৃঢ় অবস্থানে। অন্যদিকে ড. মুস্তফা সিবাঈর মতো প্রাচ্যের যেসব চিন্তাবিদরা প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের বক্তব্য সাঈদের অপেক্ষায় অনুপুঙ্খ-বিশ্লেষী ও সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সাঈদের মতো সর্বপ্লাবী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। কারণ তাঁদের ভাষা ছিল প্রাচ্যের। প্রতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচ্যীয়; যদিও তা ছিল নিখুঁত।

সাঈদ তাঁর গ্রন্থে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিকতার মুখোশ তুলনামূলক অধিক জোর-যত্ন ও গুরুত্বের সাথে উন্মোচন করে পশ্চিমের মানবতাবাদী সম্প্রদায় ও সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) গোষ্ঠীর নেকনজরে চলে আসেন। পক্ষান্তরে ড. সিবাঈ ও তাঁর সহমতের গবেষকরা পশ্চিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক পৈশাচিকতার কথা উপস্থাপনে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়ায় পশ্চিমের মানবতাবাদী সম্প্রদায় ও সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) গোষ্ঠীসহ অন্যান্য গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি পশ্চিমের সাধারণ মানুষের নেকনজর তাঁদের ভাগ্যে জুটেনি। সন্দেহাতীতভাবে এর পিছনে কারণ ছিল পশ্চিমের সৃষ্টি করা প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইন্দ্রজালের অনপনেয় প্রভাব। যে ঐন্দ্রজালিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকাকেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র এবং যৌক্তিক নিয়তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলস্বরূপ সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক পৈশাচিকতার কথা বলার পরও তাঁদের গুটিকতেক লোক ছাড়া কেউ এটা মানতে মোটেই প্রস্তুত নয় যে, প্রাচ্যের ওপর জ্ঞানতাত্ত্বিক জুলুম প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা করেছেন। আর আজকের এই আকাশসংস্কৃতির যুগে তা ক্রমশ দুরূহতর হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা এখন পূর্বাপেক্ষা আরও সহজেই জ্ঞানতাত্ত্বিক পৈশাচিকতার দ্বারা পশ্চিমের মানুষদের পাশাপাশি প্রাচ্যের মানুষদের

মনোজগতকেও বিপর্যয়করভাবে বিষিয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রাচ্যের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সর্বোপরি প্রাচ্যের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বস্তুকে তাঁরা হীন ও অপদস্থ করার আমরণ ব্রতে নিয়োজিত আছেন। বিশেষ করে নিকট প্রাচ্যের (মধ্যপ্রাচ্য) ব্যাপারে। সিবাঈ ও সাঈদ উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবেও এই নিকট প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যতাত্ত্বিক অবিচারের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন।

...this book has tried to demonstrate, Islam has been fundamentally misrepresented in the West.

অর্থাৎ,

"পাশ্চাত্যে মৌলিকভাবে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে।" [২]

পূর্বোক্ত বইয়ের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায়ও একই ব্যাপারে বলা হয়েছে।[৩] তাছাড়া ঐ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ই নিকট-প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের কোনো না কোনো মাৎস্যন্যায়ের দগদগে ক্ষতের চিহ্ন বহন করে। তবে একথা মোটেই বলা যাবে না যে, সাঈদ তাঁর বইয়ে সুদূর প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব আদৌ করেননি। সুদূর প্রাচ্যের ব্যাপারে সাঈদ যা কিছুই বলেছেন তা অদূর প্রাচ্যের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে বলা বক্তব্যের তুলনায় নিতান্তই গৌণ।

---

২. Edward W. Said, Orientalism, p. 272

৩. Three things have contributed to making even the simplest perception of the Arabs and Islam into a highly· politicized, almost raucous matter: one, the history of popular anti-Arab and anti-Islamic prejudice in the West, which is immediately reflected in the history of Orientalism; two, the struggle between the Arabs and Israeli Zionism, and its effects upon American Jews as well as upon both the liberal culture and the population at large; three, the almost total absence of any cultural position making it possible either to identify with or dispassionately to discuss the Arabs or Islam. Furthermore, it hardly needs saying that because the Middle East is now so identified with Great Power politics, oil economics, and the simple-minded dichotomy of freedom-loving, democratic Israel and evil, totalitarian, and terroristic Arabs, the chances of anything like a clear view of what one talks about in talking about the Near East are depressingly small. My own experiences of these matters are in part what made me write this book.

তাই পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিকতার পাশাপাশি জ্ঞানতাত্ত্বিক পৈশাচিকতার কথাও প্রাচ্যে ও পশ্চিমে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করা দরকার বলে আমরা মনে করি। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই ড. মুস্তফা সিবাঈর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। তাই সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিকতা এবং বিশেষত জ্ঞানতাত্ত্বিক পৈশাচিকতার মুখোশ উন্মোচনে এই বই আমাদের জন্য অনন্য এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তিন.

ড. মুস্তফা সিবাঈ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ সালে সিরিয়ায়। তিনি যে পরিবারে জন্মান সে পরিবারের বহুশত বছরের জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যোৎসাহিতার ঐতিহ্য সুবিদিত। তাঁর সুপণ্ডিত বাবা হাসানি সিবাঈর আদর্শ তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বাবার মতো তিনিও সর্বস্ব উজাড় করে সাম্রাজ্যবাদিতার বিরোধিতা করেছেন। এজন্য তাকে বহুবার কারাবরণও করতে হয়। প্রথমবার যখন ফরাসি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে তাকে বন্দি করা হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। তাঁর ওপর অভিযোগ আনা হয় তিনি ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি করেছেন। পরবর্তীতে আবার তাকে বন্দি করা হয় ফরাসি সাম্রাজ্যের দখলদারিত্ব ও জোরজুলুমের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করার জন্য। সিরিয়ায় শেষবার যখন তাকে বন্দি করা হয় তখনও সেই একই কারণ। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে তুলেন এবং উজ্জীবিত জনতা একসময় ফরাসিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে।

এখানেই শেষ নয়। তিনি ১৯৩৩ সালে মিসরে গমন করেন পড়ালেখা করার জন্য। সেখানে গিয়ে তিনি আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাই ব্রিটিশ সরকারের আদেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ড. মুস্তফা সিবাঈকে সিরিয়ায় মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। সাংগঠনিক হিসেবে তিনি তাঁর সময়কার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গতানুগতিক নেতাদের মতো ছিলেন না। যারা আরাম কেদারায় বসে কেবল দিকনির্দেশনা দিয়েই নিজেদের কর্তব্যপরায়ণতার পাঠ সমাধা করতেন।

ড. মুস্তফা সিবাঈ সামনে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সশরীরে যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে যুদ্ধ করেছেন। ১৯৪৮ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মীরা যখন ফিলিস্তিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখন তিনি সিরিয়ান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। ফিলিস্তিনের হয়ে ইসরাইলের (ও তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মিত্র গোষ্ঠীর) বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে সম্মিলিত আরব বাহিনীর প্রধান ছিলেন জর্দানের (ট্রান্স-জর্দান) ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান John Glubb। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ব্রিটিশ জেনারেল ও তাঁর অনুগতজনদের বিতর্কিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্তের কারণেই মূলত সেই যুদ্ধের ফলাফল ফিলিস্তিনের সাধারণ জনতা ও আরববিশ্বের তাবৎ মানুষের বিপক্ষে যায়। বরং সত্যকথনের স্বার্থে বলতে হয়, সেই যুদ্ধের ফলাফল ছিল সমগ্র মানবতার বিপক্ষে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ড. মুস্তফা সিবাঈর মতো মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ে আপোসহীন মনীষাদের জন্য এই যুদ্ধ ও তার ফলাফল সুখকর কিছু বয়ে আনবে না। বরং এই ঘটনায় তিনি যারপরনাই সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং নিজ দেশ সিরিয়ায় ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে তিনি ঐসব নেতা ও তাঁদের অনুচরদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি তিনি মিসরি বাহিনীকে দুর্বল অস্ত্র প্রদান, ইরাকি সামরিক নেতাদের ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করার আদেশ না দেয়া এবং ইহুদিদের ইউরোপ ও আমেরিকার অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাকার বিষয়গুলো জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। ড. সিবাঈ তাঁর ফিলিস্তিন যুদ্ধে ব্রাদারহুড নামক গ্রন্থে বলেন–

"আমরা যখন জেরুসালেমের যুদ্ধের ময়দানে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই অনুভব করেছিলাম যে, আরব রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতিবিদ এবং আন্তর্জাতিক মহলে কোনো না কোনো ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছে। আর এজন্যই আমাদের জেরুসালেম ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই আমরা ব্রাদারহুডের ব্যাটালিয়ানে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী তা নিয়ে পরামর্শে বসলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে জেরুসালেম ত্যাগ করার আদেশ অমান্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমরা দামেস্কে পৌঁছার পর আমরা গোপনে আমাদের ব্রাদারহুডের কিছু সদস্যকে জেরুসালেমে পাঠাবো। যাতে করে আমরা ফিলিস্তিনের ভাইদের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে পারি।

সিরিয়ায় এসে আমি আলেপ্পো দামেস্ক লাযাকিয়াসহ সিরিয়ার বহু শহরে সফর করলাম এবং সেখানকার লোকদের সামনে ফিলিস্তিনে কী হচ্ছে তা তুলে ধরলাম। সাধারণ মানুষ আমার কথা শুনে চমকে গেল। কেউ কেউ আমার কথার ওপর সন্দেহ করতে লাগল। তবে বিষয়টি যখন সবার সামনে খোলাসা হলো তখন আমার বক্তব্যের সত্যতা তারা বুঝতে পারল। তাই ফিলিস্তিন যুদ্ধের ময়দানে কী হচ্ছে এবং ময়দানের বাইরে কী হচ্ছে তা বুঝতে আর বাকি রইলো না।"

মোটকথা, ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী দুর্বৃত্তদের বিপক্ষে ড. মুস্তফা সিবাঈর অবস্থান ছিল বরাবরই পর্বতসম অবিচল। যেকোনো জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাতকে নিজের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার ওপর আঘাত মনে করতেন। তাই সাম্রাজ্যবাদী কিংবা মানুষের স্বাধীনতার বিপক্ষের লোকেরা যে দেশেই মানুষের স্বাধীনতাকে পদদলিত করেছে সে দেশের মানুষের পাশেই তিনি দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে বরাবরই তিনি ছিলেন আপোসহীন।

১৯৪৮ সালে ড. সিবাঈ দেশে ফিরে মূলত সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ অব্যাবস্থাপনাগুলো সংশোধন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর ১৯৫০ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সিরিয়ার আইন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি ফ্যাকাল্টি অব শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা পেশ করেন। ইউনিভার্সিটি অব দামেস্ক তাঁর সেই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে তাঁকে ঐ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিন হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেন।

সিবাঈ তাঁর জীবদ্দশায় এককভাবে ও যৌথভাবে একাধিক সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পাদনার কাজও করেন। যে পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই কোনো না কোনো সময় ক্ষমতাসীনদের রোষানলের শিকার হয় এবং তাঁদের বিপক্ষে কথা বলার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। যার প্রত্যেকটিই মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো–

১. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী।
২. ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা।
৩. ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র।
৪. নিকট প্রাচ্যের নিখুঁততর দার্শনিক মতবাদ।
৫. আমাদের সামাজিক জীবনাচার।
৬. এক অনন্য সভ্যতার কথা।
৭. ইতিহাসে মুসলিম মনীষাগণ।
৮. ইসলামে শান্তি ও যুদ্ধের বিধান।
৯. পার্সোনাল লয়ের ভাষ্য ১ম ও ২য় খণ্ড।
১০. ইসলামের সাম্যবাদ।
১১. প্রকৃত ইসলাম ১ম ও ২য় খণ্ড।
১২. যেভাবে জীবন আমাকে শিখিয়েছে।

১৯৬৪ সালে এই মহান চিন্তানায়ক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ড. সিবাঈ বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৯ বছর। তাঁর কর্মপ্রাচুর্যের তুলনায় এ যেন নিতান্তই সামান্য সময়। তিনি প্রকৃতঅর্থে যুদ্ধের ময়দানের একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ও তুখোড় অধ্যাপক ছিলেন? তিনি কি একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন নাকি ছিলেন একজন বিদগ্ধ কলমসৈনিক? আসলে তাঁর বিচিত্র কর্মময় এবং সংগ্রামমুখর জীবনের দিকে তাকিয়ে কোনো একক অভিধায় তাঁর গুণপনাকে সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করা সত্য ও বাস্তবতার প্রতি অবিচার বৈ কিছু নয়।

চার.

European interest in Islam derived not from curiosity but from fear of a monotheistic, culturally and militarily formidable competitor to Christianity

অর্থাৎ, ইসলামের প্রতি ইউরোপিয়ানদের আগ্রহ নিছক কৌতূহলজাত নয়, বরং খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী এবং সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিক থেকে ভয়ানক এক প্রতিপক্ষের ভয় থেকে সৃষ্ট।[৪]

---

[৪] Edward w. said, Orientalism, p. 343

এই ভয়টা ছিল খৃস্টবাদের আনুসারীদের। তাই তাঁরা নিকট প্রাচ্যের ব্যাপারে যতটুকু জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিশ্রম করেছেন ততটুকু পরিশ্রম সুদূর প্রাচ্যের কোনো ধর্ম বা দেশের জন্য করেননি বা করতে হয়নি। কারণ সুদূরপ্রাচ্যে ইসলামের মতো শক্তিশালী কোনো (তাঁদের কাছে ভয়ানক) প্রতিপক্ষের মুখোমুখি তাঁদের হতে হয়নি। তাই তাঁদের মোটামুটি ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ৬০ হাজার বই রচনা করতে হয় নিকটপ্রাচ্য সম্পর্কে।[৫] যার বেশির ভাগই ছিল সাম্রাজ্যবাদী কিংবা মিশনারি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এর সূচনা হয় অনেক আগেই। ১৪ শতকের শুরুর দিকে রেমন্ড লুল আরবি বিদ্যা শিখার আদেশ দিয়েছিলেন আরবদের খৃস্টান বানানোর জন্য।[৬]

এভাবেই প্রাচ্যতত্ত্বের পূর্ণরূপ আরোপিত হয় মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক তত্ত্বে। তাইতো অদূরপ্রাচ্যের দেশ ও তথাকার ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমের একটা অলিখিত সন্ধি হয়ে গেলেও মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম ও মানুষের সাথে সন্ধি হওয়ার সুদূরতম কোনো সম্ভাবনাও দেখা যায় না। বরং উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা আরও সুসংহত ও সুপরিকল্পিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম (ইসলাম) সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতিপক্ষ করা হচ্ছে। তাই বলা যায়, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিরাট অংশ নিকট প্রাচ্যকে নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যকার কল্পিত অমনাবিক বিভেদরেখাকে মুছে দেয়ার জন্য নয়। বরং সেই অমানবিক বিভেদরেখাকে পূর্বের চেয়ে আরও প্রকটতর ও অতিকায় করে তোলার জন্য। যেন তাঁরা প্রাচ্যকে আরও নিখুঁতভাবে অবদমিত ও মারাত্মকভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে।

কামরুল হাসান নকীব
২ আগস্ট, ২০১৭ খৃস্টাব্দ

---

[৫] Edward w. said, Orientalism, p. 204
[৬] Francis Dvornik, The Ecumenical Councils (New York: Hawthorn Books, 1961), pp. 65-6.

ওরিয়েন্টালিজমের
প্রথম পাঠ

প্রাচ্যতত্ত্ব ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক

প্রাচ্যতত্ত্বসংক্রান্ত গবেষণায় সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের কেউই ব্যাপক কোনো জ্ঞানগর্ভ গবেষণা উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের গবেষণায় উঠে আসেনি একাধারে প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর ভালো-মন্দ দিকগুলো। এছাড়াও তারা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন শ্রেণিভেদ ও তাদের কর্মধারাসমূহ কিংবা তাদের গবেষণায় কোথায় কোথায় তারা সত্যাশ্রিত ও মিথ্যাশ্রিত ছিলেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ হাজির করতে সক্ষম হননি। প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে যা কিছু রচিত হয়েছে তার কোনোটিতে রয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নিছক গুণকীর্তন। যেমন– নাজিব আকিকির বই 'প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ'।[৭] নতুবা ওইসব রচনায় রয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মিশনারি ও সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির নিতান্তই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্মটি হচ্ছে আজহার ইউনিভার্সিটির 'ইসলামি সংস্কৃতি' বিভাগের মহাপরিচালক ড. মুহাম্মাদ বাহি-এর একটি মূল্যবান বক্তৃতা। যে বক্তৃতাটি তিনি প্রদান করেন আজহার ইউনিভার্সিটির সভাকক্ষে (বৃহৎ অডিটোরিয়ামে)।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ওপর নির্ভরতা ও ভরসা এবং তাদের কাজের নির্বিচার প্রশংসার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক স্বনামধন্য গবেষক বাড়াবাড়ি করেছেন।

---

৭ আল মুসতাশরিকুন

তাদের এসব মুগ্ধজনদের অন্যতম হলেন ড. তহা হুসাইন[৮]। যিনি আমাদের আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রথম সারির শিষ্যদের একজন। আর তাই তো তিনি তার 'জাহিলিযুগের সাহিত্য' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন—

> 'প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা প্রাচ্যের ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণার সময় যে বহুবিধ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানে না এবং জানার আগ্রহ পোষণ করে না এমন কোনো আরবি সাহিত্যের অধ্যাপকের কথা কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানযুগে একজন আরবি সাহিত্যের অধ্যাপককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারস্থ হতেই হয়। আর তাদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তরও নেই। উপরন্তু আমরা তো এর মাধ্যমেই নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবো এবং নিজেদের ডানায় ভর করে উড়তে পারবো এবং আমরা আমাদের ওইসব ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারবো যেসব ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের ছাড়িয়ে গেছেন। যেমন– আমাদের নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে।'

নিঃসন্দেহে একথাগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক দাসত্বের সময়কার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। যে সময়টা আমরা অতিক্রম করে এসেছি আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের সূচনালগ্নে। আর এই মানসিক দাসত্বের শিকার হয়েছেন ড. তহা হুসাইন তার নিজ গ্রন্থ 'জাহিলি যুগের সাহিত্যে'। যেটা ছিল ডেভিড সামুয়েল মারগোলিয়ুসের মতো আরব ও ইসলামবিদ্বেষী চরমভাবাপন্ন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অভিমতগুলোর একনিষ্ঠ চর্বিতচর্বণ। মারগোলিয়ুসের সকল অভিমত ড. তহা হুসাইন নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন তার বরাত ছাড়াই। উল্লিখিত গ্রন্থে ফলত ড. তহা হুসাইন নিজস্ব কোনো নতুন মতামত উপস্থাপন করেননি। দাঁড় করাতে পারেননি কোনো জ্ঞানগর্ভ গবেষণা। কিংবা বলা যায়, এর কোনো চেষ্টাও তিনি করেননি।

---

[৮] ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) বিশ শতকের আরব বিশ্বের একজন প্রভাবশালী মিশরি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ। তিনি ১৪ বার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তথাপি নোবেলপ্রাপ্তি তার ভাগ্যে জুটে নি।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের আরেকজন অনুকারক ও প্রতিনিধি হলেন অধ্যাপক আহমাদ আমিন। তিনি তার 'ইসলামের প্রথমপ্রহর' ও 'ইসলামের দ্বিপ্রহর'[৯] নামক জগদ্বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুকরণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি আমার সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা' (আস সুননাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিইল ইসলামি) নামক বইয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি তিনি তার বই 'ইসলামের প্রথমপ্রহরে'র 'হাদিস' অধ্যায়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতামতগুলো কীভাবে চুরি করেছেন। অথচ একবারও প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ঋণ স্বীকার করেননি।

ড. আলি হাসান আব্দুল কাদিরও তাদের অন্যতম যারা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যার প্রমাণ মেলে তার 'ইসলামি ফিকহের ইতিহাসের উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণ' (নাজরাতুন আম্মাতুন ফি তারিখিল ফিকহিল ইসলামি) নামক গ্রন্থে। যে বইটা প্রকৃতঅর্থে গোল্ডজিহেরের 'ইসলামি পাঠ' (দিরাসাতুন ইসলামিয়্যাহ) ও 'ইসলামে বিশ্বাস ও বিধান' (আল আকিদাতু ওয়াশ শরিআতু ফিল ইসলাম) এই দুই বইয়ের আক্ষরিক অনুবাদ। ইতোপূর্বে আলোচিত দুই অধ্যাপকের মতো তিনিও মোটেই আস্থাভাজন-আমানতদার ছিলেন না। কারণ তিনিও তার প্রাচ্যতাত্ত্বিক গুরুদের মতামতগুলোকে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করা ছাড়াই।

ড. আলি হাসান আব্দুল কাদির আমার জানামতে এখন লন্ডনস্থ 'ইসলামি সংস্কৃতি সেন্টারে'র পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। তার সাথে ঘটে যাওয়া আমার একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করছি। কারণ এতে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। সর্বোপরি এই ঘটনাটিই আমার বই 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা' (আস সুননাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিইল ইসলামি) রচনার মূল কারণ ছিল। ঘটনাটি বলার আগে আমি তার মহানুভবতা, চারিত্রিক সরলতা ও প্রকৃত সত্য তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হওয়ার পর অকপটে সত্যকে গ্রহণ করার মহৎ প্রবণতার কথা স্বীকার করে নেয়া উচিত মনে করি।

---

[৯] আহমদ আমিন (১৮৮৬-১৯৫৪) বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। এখানে আলোচিত তার দুটি বইয়ের আরবি নাম হলো, "ফাজরুল ইসলাম" এবং "দুহাল ইসলাম"।

১৯৩৯ সালে আমরা তখন শরিআ ফ্যাকাল্টিতে 'ইসলামি আইনশাস্ত্র ও তার মৌলনীতি এবং ইসলামি আইন প্রণয়নের ইতিহাস' বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তখন শাইখ মারাগির সময়কাল। আজহারের প্রফেসর আলি হাসান আব্দুল কাদির আমাদের ইসলামি আইন প্রণয়নের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। যিনি উসুলুদ্দিন কলেজের ইতিহাস বিভাগের গ্রাজুয়েট এবং সম্প্রতি জার্মানিতে ৪ বছর পড়াশোনা করে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

তার সাথে আমাদের প্রথম ক্লাসটি তিনি শুরু করেন এভাবে– 'আমি তোমাদের ইসলামি আইন-প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াব। তবে তা এমন এক বৈজ্ঞানিক পন্থায় যার সাথে এই আজহার বিশ্ববিদ্যালয় মোটেই পরিচিত নয়। আর এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি আজহারে প্রায় চৌদ্দ বছর পড়াশোনা করার পরও ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করতে পারিনি। ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করেছি জার্মানিতে পড়ার সময়।' একথা শুনে আমরা শিক্ষার্থীরা রীতিমতো স্তম্ভিত। আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম– 'অধ্যাপক মহোদয়ের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। হয়তো তিনি যথার্থই এমন কিছু জেনেছেন যার সাথে আজহার আদৌ পরিচিত নয়।' তারপর তিনি তার সামনে রাখা একটি বৃহদাকার বই থেকে অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ করে আমাদের হাদিসের ইতিহাস পড়াতে লাগলেন।

পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছিলাম ওটা ছিল গোল্ডজিহেরের 'ইসলামি পাঠ'। যেটার লেখাগুলো তিনি নকল করছিলেন আর বোঝাচ্ছিলেন যে এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। তিনি তার পাঠদান চালিয়ে যেতে লাগলেন আর আমাদের কাছে যখন মনে হতো তিনি ভুল বলছেন, তখন আমরা তার আপত্তি জানাতাম। কিন্তু গোল্ডজিহের তার এ গ্রন্থে যা লিখেছেন তার বিরোধিতা করতে অধ্যাপক আব্দুল কাদির কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। তার পাঠের একপর্যায়ে তিনি যখন ইমাম জুহরি সম্পর্কিত আলোচনায় উপনীত হন, তিনি ইমাম জুহরি রহ.-এর ওপর উমাইয়াদের পক্ষে হাদিস বানানোর অভিযোগ আরোপ করলেন। আমি আপত্তি জানালাম এবং ইমাম জুহরি সম্পর্কে আমার অল্পবিস্তর ধারণাকে পুঁজি করে আমি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়ে বললাম– 'ইমাম জুহরি রহ. হাদিসের ইমাম তথা হাদিসের ক্ষেত্রে যথার্থ অনুসরণীয় ব্যক্তি ও উলামা বা বিশেষজ্ঞদের নির্ভরতার আধার।' তথাপি তিনি তার

মতামতে অবিচল রইলেন। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই আমি ইমাম জুহরি সম্পর্কে গোল্ডজিহেরের যাবতীয় বক্তব্যের অনুবাদ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে হাতে লিখে দুই পৃষ্ঠায় তা অনুবাদ করে দিলেন।

আমি ইমাম জুহরির জীবনী নিয়ে গবেষণা ও ইমাম জুহরির ওপর এই প্রাচ্যতত্ত্ববিদের আরোপিত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার জন্য পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে ঢুঁ মারতে শুরু করলাম। আজহারের গ্রন্থাগার ও দারুল কুতুব আলমিসরিয়্যাহের গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত চরিতাভিধানের প্রত্যেকটি বই আমি পড়ে ইমাম জুহরি রহ. সম্পর্কে যা পেয়েছি টুকে নিয়েছি। তিন মাস যাবত আমি একাজে ডুবেছিলাম। আমার ভার্সিটির ক্লাস শেষ করার পর থেকে রাতের শেষ মুহূর্তগুলো পর্যন্ত। আমি সঠিক তথ্যগুলো সংগ্রহ করে অধ্যাপক সাহেবকে বললাম– এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গোল্ডজিহের জুহরি সম্পর্কিত পূর্বাচার্য তথা পূর্ববর্তী প্রাচীন লেখকদের যাবতীয় তথ্যকে বিকৃত করেছেন। তিনি আমাকে এই বলে জবাব দিলেন– এটা অসম্ভব। কেননা প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা– বিশেষ করে গোল্ডজিহের– এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা ন্যায়নিষ্ঠ। তারা পাঠ বা তথ্য এবং সত্যকে বিকৃত করতে পারেন না।

তখনই আমি সংকল্প করলাম এ বিষয়ে জমিয়াতুল হিদায়াতিল ইসলামিয়ার কক্ষে একটি বক্তৃতা দেবো। জমিয়তের পরিচালনা কমিটির কাছে এ বক্তৃতার জন্য আজহারের সব অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করলাম। সেদিন বিপুলসংখ্যক অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল কাদির সাহেবও ছিলেন। আমি তাকে এই বক্তৃতার অনুষ্ঠানে আসার ও আমার বক্তৃতার ব্যাপারে তার মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ও সানন্দে উপস্থিত হলেন। আর আমার বক্তৃতা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন।

এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত হয়েছিল ইমাম জুহরি সম্পর্কে গোল্ডজিহেরের মন্তব্যগুলোকে কেন্দ্র করে। বক্তৃতার সমাপ্তি টেনেছিলাম এভাবে– 'এতক্ষণ যা বললাম তাই হচ্ছে ইমাম জুহরি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের এবং আমার মতামত। এই বিষয়ে অধ্যাপক আব্দুল কাদির সাহেব যদি আমার আলোচনায় অনাশ্বস্ত এবং আমার আলোচনা অসন্তোষজনক মনে করেন এবং

ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন তাহলে আমি তাকে অনুরোধ করবো এখানে এসে কিছু বলার জন্য।' তারপর অধ্যাপক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন– 'আমি স্বীকার করছি, আগে আমি জুহরিকে জানতাম না । অবশেষে আজকে জানলাম। আর তোমার আলোচনার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সমাবেশ শেষ হয়ে গেলে আমরা জমিয়তের প্রধান অধ্যাপক খিযর আল হাসানের রুমে ঢুকলাম। তিনি পরে আজহারের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। অধ্যাপক আব্দুল কাদির তার সামনেই আমাকে যা বললেন তা হলো– 'তোমার এই গবেষণাটি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গবেষণার ওপর অভিনব উন্মোচন। আর আমি চাই তুমি এর একটা কপি আমাকে দেবে। আমি এটা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের আলোচনা-পর্যালোচনার প্রতি যত্নশীল জার্মানির গবেষণামূলক পত্রিকাগুলোতে পাঠাবো। আমার বিশ্বাস এটা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে।' তারপর আমি তাকে তার মূল্যবান অভিব্যক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং তার একথাকে একজন ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য হিসেবে জ্ঞান করে কৃতার্থ হলাম।

কিছুদিন পর তিনি আমাকে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে মনস্থির করলাম গ্রীষ্মকালে আমরা দুজন যৌথভাবে গোল্ডজিহেরের বইটির একটি প্রতিবাদ ও এর অনুবাদ করব। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কায়রোতে আমি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী দ্বারা কারাগারে অন্তরীণ হই। যুদ্ধের পর সাতটি বছর কেটে গেল। ইত্যবসরে আব্দুল কাদির সাহেব তাঁর গ্রন্থ 'ইসলামি ফিকহের ইতিহাসের উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণ' প্রকাশ করলেন। এব্যাপারে আমার জানার সুযোগ আসে তিন বছর পর। যখন আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে কারামুক্তি লাভ করি।

এই হলো ড. আলি হাসান আব্দুল কাদির সাহেবের সাথে আমার কাহিনি। আমি আশা করি তিনি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের– বিশেষত গোল্ডজিহেরের প্রতি পূর্বের বিশ্বাস থেকে ফিরে এসেছেন এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আমানতদারিতা, সত্যের প্রতি আন্তরিকতা ও তথ্যকে বিকৃত না করে উপস্থাপন করার প্রতি।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গবেষণার ওপর নির্ভরতার এই চরমপন্থী মনোভাবের বিপরীতে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গির দেখা মিলে, যা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি ও চরম জাত্যাভিমানী মনোভাবের বিপরীতে উস্কানি জোগায়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আহমাদ ফারিস শিদয়াকের গ্রন্থ 'যাইলুল ফারইয়াক'।

> 'এই প্রাচ্যবিদ প্রফেসাররা কোনো বিষয়-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেননি। তারা বরাবরই (প্রাচ্যের) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিছক আস্ফালন ও শিশুসুলভ আচরণ করে গেছেন। প্রাচ্যবিদ্যায় তাদের যে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যার্থী গ্রাজুয়েট হয়েছেন তারা নিছক ধর্মযাজকবৃত্তির ওপর গ্রাজুয়েট হয়েছেন। গ্রাজুয়েট হয়ে তারা মনগড়া বিক্ষিপ্ত ধারণা মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন করেন কিংবা বলা যায় খোদ তাদের মস্তিষ্ককেই সংস্থাপন করেছেন ওইসব মনগড়া বিক্ষিপ্ত ধারণার মাঝে। আর তাদের এরূপ কাজের ভিত্তিতেই তারা ভেবে বসেন যে, তারা কিছু একটা জানতে পেরেছেন। প্রকৃত সত্য হলো, তারা সেই ব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ। তাদের কেউ যখন প্রাচ্যের কোনো ভাষা পড়ান বা প্রাচ্যের ভাষায় কিছু অনুবাদ করেন তখন সে যেন তাতে দিশাহীন অন্ধের মতো পদচারণা করতে থাকেন। আর যখনই এই প্রাচ্যের ভাষা পড়াতে বা প্রাচ্যের ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে কোনো বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন তখনই নিজের পক্ষ থেকে যাচ্ছেতাই বানিয়ে চালিয়ে দেন। তখন আর সংশয় ও প্রত্যয় কিংবা সন্দেহ ও বিশ্বাসের আলাদা কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। অগত্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে দুর্বল মতকে প্রাধান্য দিতে বা অযৌক্তিক মতকে প্রাধান্য দিতে তারা ব্যাপৃত হন।'

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কৃতকাজ ও গবেষণার নতুন নতুন পটভূমি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস তারা সৃষ্টি করে গেছেন, প্রকৃত অর্থে এই নির্বিচার প্রশংসা ও নির্বিচার বিমুখতার প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। আর আমরা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদের ধর্ম তাদের শত্রুর সাথেও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে নির্দেশ দেয়— 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের অবিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে।' (সূরা মায়েদা : ৮)

প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস

সর্বপ্রথম পশ্চিমের কোন ব্যক্তি প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং সেটা কোন সময় ছিল, তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে এতটুকু নিশ্চিত করে জানা যায় যে, কতিপয় পশ্চিমের সন্ন্যাসী আন্দালুসের শৌর্য-বীর্য ও স্বর্ণযুগে আন্দালুসে আগমন করে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। কুরআন ও আরবি গ্রন্থসমূহ তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন– বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে।

এ সন্ন্যাসীদের প্রথম কাতারে রয়েছেন ফরাসি সন্ন্যাসী (জার্বার্ট) JERBERT, যিনি আন্দালুসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভের পর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ৯৯৯ খৃস্টাব্দে রোমের গির্জার পোপ নির্বাচিত হন। এবং মহামান্য পিটার (১০৯২- ১১৫৬) ও ক্রেমনা'র জেরার্ড (১১১৪-১১৮৭)।

এই সন্ন্যাসীরা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আরবদের সংস্কৃতির ও আরবদের প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞদের রচনাকর্মের প্রচার শুরু করলেন। আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য তারা 'বাদওয়ি'র মতো আরবি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আর আশ্রম ও বিদ্যালয়গুলোতে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদ করে পড়াতে লাগলেন লাতিন ভাষায়। যে ভাষাটি তখন ইউরোপের প্রতিটি দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এই আরবি বিদ্যালয়গুলোতে আরবি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে ও সেগুলোকে গবেষণার মূল উৎস জ্ঞান করে অব্যাহতভাবে চলতে লাগল পাঠদান প্রায় ছয় শতাব্দী যাবত।

এরপর থেকে এই কর্মক্ষেত্রটি আর কখনই জনশূন্য হয়নি। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা ইসলাম ও আরবি ভাষার পাঠদান এবং কুরআনের ভাষান্তর, আরবি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করতে লাগলেন। একপর্যায়ে ১৮ শতক চলে এল। এই সময়টা ছিল এমন একটা সময় যখন পশ্চিমারা ইসলামি দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালাতে শুরু করে এবং ইসলামি ভূখণ্ডগুলো অধিগত করতে থাকে। তখনই কিছুসংখ্যক পশ্চিমের গবেষক– যারা আশৈশব প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর দীক্ষিত হয়েছিলেন তারা পশ্চিমের প্রতিটি দেশে প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং আরব ও ইসলামি দেশগুলোতে হস্তলিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহের প্রতি তাদের কুদৃষ্টি পড়লো। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশিত দেশগুলোর অপরিণামদর্শী ও সরলমনা বাসিন্দাদের কাছ থেকে তা ক্রয় করে নেন। আর না হয় নেহাৎ অনিয়মগ্রস্ত গণগ্রন্থাগারগুলো থেকে তা চুরি করে তাদের নিজ দেশ ও গ্রন্থাগারগুলোতে পাচার করে দেন। ফলে আরবি হস্তলিখিত গ্রন্থের এক ভীতিপ্রদ-সংখ্যা ইউরোপের গ্রন্থাগারে পাচার হয়ে যায়। যে বইয়ের সংখ্যা উনিশ শতকের সূচনালগ্নেই ২ লাখ ৫০ হাজারে পৌঁছে যায়। অদ্যাবধি সে সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলছে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ১৮৭৩ সালে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। পরে নিয়মিতভাবে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। যেখানে প্রাচ্য, প্রাচ্যের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা উপস্থাপন করা হত। অদ্যাবধি এ সম্মেলন অব্যাহত রয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা বা পরিধি

ইতোপূর্বেই আমরা জেনেছি, প্রাচ্যবাদের সূচনা হয় আরবি ভাষা ও ইসলামের গবেষণা দিয়ে। প্রাচ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্য বিস্তারের পর যদিও আজ পর্যন্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ যা কিছু নিয়ে গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে ইসলাম, আরবি সাহিত্য ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তথাপি প্রাচ্যতত্ত্ব পূর্ণতা পেয়েছে প্রাচ্যের সকল ধর্ম, জীবনাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভূগোল , রীতিনীতি ও প্রাচ্যের অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ভাষার গবেষণা দিয়ে। আর এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। যা তাদের প্রাচ্য নিয়ে গবেষণায় প্রলুব্ধ করেছে। যেমনটা আমরা অব্যবহিত পরে আলোচনা করব।

প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্দেশ্য বা কার্যকারণসমূহ

১. ধর্মীয় কার্যকারণ

পশ্চিমাদের প্রাচ্যতত্ত্বের প্রথম কার্যকারণ সম্পর্কে কোনো প্রকার অনুমান ও শ্রমসাধ্য গবেষণা ছাড়াই আমরা যা অবগত হতে পারি তা হলো, ধর্মীয় কার্যকারণ বা উদ্দেশ্য। যেটার সূচনা হয় সন্ন্যাসীদের দ্বারা (যেমনটা আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি) এবং তা আমাদের আধুনিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে (যা আমরা একটু পরেই জানতে পারব)। তারা ইসলামের ওপর অপবাদ আরোপ, ইসলামের সৌন্দর্য ও বাস্তবিকতাকে বিকৃত করতে উদ্যত হয়েছেন। এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পশ্চিমের ধর্মীয় নেতাদের কৃতকর্মের দরুন বিব্রত ও লজ্জিত সাধারণ জনগণের সামনে এটা প্রমাণ করা যে, ইসলাম হচ্ছে প্রচারের অযোগ্য একটি ধর্ম। মুসলিমরা হচ্ছে বর্বর, চোর, রক্তপিপাসু একটি জাতি (কারণ পশ্চিমাদের কাছে ইসলামই ছিল খৃস্টবাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী)। এদের ধর্ম এদের দৈহিক ভোগবৃত্তির প্রতি উৎসাহিত করে। আর যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি থেকে বিরত রাখে।

অতঃপর আধুনিক যুগে পশ্চিমারা যখন দেখল আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তিগুলোকে নড়বড়ে বানিয়ে দিয়েছে তখন তারা ইসলামের ওপর আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকে। তাই প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ ইতোপূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহ[১০] দ্বারা পশ্চিমের সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করতে শুরু

---

[১০] আর এসব ধর্মীয় নেতারা ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিল তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে– যারা স্পেনে ও আরবে এসে ইসলাম ও মুসলিমদের জ্ঞানসম্পদ নিয়ে পড়াশোনা করেছিল। যেমনটা লেখক ইতোপূর্বে বলে এসেছে।

করল। কিন্তু প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের মাত্রার এই বাড়বাড়ন্ত ও আধিক্য পশ্চিমাদের কাছে বিদ্যমান পবিত্র গ্রন্থাদি ও ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা থেকে পশ্চিমের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে মোটেই অন্যত্রে নিবদ্ধ করতে পারেনি। উপরন্তু ইসলামের প্রথম বিজয়সমূহ, ক্রুসেড যুদ্ধ ও উসমানি সাম্রাজ্যের বিজয়সমূহ পর্যায়ক্রমে পশ্চিমের সাধারণ মানুষের অন্তরে ইসলামের সামর্থ্য সম্পর্কে যে সমীহ সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তারা মোটেই বেখবর নন। পাশাপাশি তারা ইসলামের অনুসারীদের প্রতি উন্নাসিকতা ও অবজ্ঞার পরিণামের কথাও ভুলে যাননি। সুতরাং তারা তাদের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম নিয়ে গবেষণার প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উল্লেখ্য, প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা তাদের শাস্ত্রীয় গবেষণায় মিশনারি উদ্দেশ্যের কথা ভুলে বসেছেন— এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা তারা সবাই প্রথমত ধর্মের প্রতিনিধি। তাই তারা লক্ষ্যস্থির করলেন, মুসলিমদের সাংস্কৃতিক কর্ণধারদের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে হবে। যাতে তারা ইসলামি আকিদার ভেতরে বিচ্যুতি-বির্পযয় ও বিকৃতির সন্নিবেশ ঘটাতে পারে। ইসলামের নিজস্ব ঐতিহ্য, সভ্যতা– সর্বোপরি যা কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামের সাথে সংযুক্ত সবকিছুর প্রতিই বীতশ্রদ্ধতা, আস্থাহীনতা ও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে।

২. ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকারণ

ক্রুসেডারদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধের (ক্রুসেড যুদ্ধ বাহ্যত ধর্মযুদ্ধ হলেও মূলত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল) পরিসমাপ্তি হওয়ার পরও পশ্চিমারা পর্যায়ক্রমে আরব ও ইসলামি ভূখণ্ডগুলোকে পুনরায় অধিগত করার সংকল্প থেকে নিরস্ত হয়নি। তাই তারা এই ভূখণ্ডগুলোর যাবতীয় বিশ্বাস, জীবানাচার, শিষ্টাচার ও ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি ইত্যাকার বিষয় নিয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণা ও বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। যাতে পশ্চিমারা মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্যের উৎস নির্ণয় করে সেগুলোকে অকেজো করতে পারেন এবং দুর্বলতা ও অক্ষমতার উৎস নির্ণয় করে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। আর একপর্যায়ে যখন তাদের সামরিক বিজয় ও রাজনীতিক আধিপত্য বিস্তারের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েই গেল তখন তাদের প্রাচ্যতত্ত্বকে আকড়ে থাকার বা প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণবোধ করার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ছিল।

সেই কারণগুলো হলো– আমাদের (মুসলিমদের) অন্তরের প্রতিশোধের ক্ষোভকে অবদমিত করা এবং আমাদের মনোজগতে হিনম্মন্যতা ও চিন্তাজগতে জটিলতা বা অবিমৃশ্যতা সঞ্চার করা। একাজটা তারা সম্পাদন করেছেন আমাদের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান-সম্পদ বা ঐতিহ্য এবং আমাদের বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি বীতশ্রদ্ধতা বা সংশয় তৈরির মধ্য দিয়ে। ফলে আমরা নিজেদের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছি, ঝাঁপিয়ে পড়েছি পশ্চিমের কোলে। আমাদের বিশ্বাসের রূপরেখা ও শিষ্টাচারের মাপকাঠি কী হবে তা ভিক্ষা চেয়েছি পশ্চিমের কাছে। মূলত এভাবেই পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামনে আমাদের মাথাকে নত করার যে মনোবাসনা তাদের ছিল তা পূর্ণ হলো। তাদের ইচ্ছা ছিল আমরা যেন তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সামনে এমনভাবে মাথানত হই যেন আমাদের কেউ তারপর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, দেখুন কীভাবে তারা আমাদের ঐতিহাসিক বহুজাতিক ভূখণ্ডগুলোতে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়েছে। কালাবর্তে যে সাম্প্রদায়িকতা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আরববিশ্ব ইসলামের বাণীকে আপন করে নেয়ার পর থেকে। তাই তো আমাদের ভাষা, বিশ্বাস ও ভূখণ্ডগুলো একতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আরবরা ইসলামের এই বাণীকে বিশ্বের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। প্রতিষ্ঠা করে আরবদের মাঝে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে মানবিকতার সম্পর্ক, ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন। এতে আরবদের শক্তিমত্তা আরও বেড়ে যায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরও সমুন্নয়ন ঘটে ও ইসলামের আলোয় তারা আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা অর্ধশতাব্দী যাবত মিসরে ফেরাউনি মতবাদ, সিরিয়া লেবানন ফিলিস্তিনে ফিনিশীয় মতবাদ, ইরাকে এসিরীয় মতবাদকে পুনর্জীবিত করতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে আমাদের একজাতিক-একতাবদ্ধতাকে নষ্ট করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। যেন তারা আমাদের স্বাধীনতার উদ্দীপনা-শক্তিকে অবদমিত করে আমাদের সহজ ও সামর্থ্যের মধ্যে থাকা স্বাধীনতার আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা, ভূমি ও সম্পত্তিতে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যেন বাধ সাধতে পারে এবং নতুন করে সভ্যতার বাগডোর ধারণ করা থেকে আমাদের নিরস্ত করতে পারে। সর্বোপরি আমাদের ভেতর বহুজাতিক অনৈক্য সৃষ্টি করে তারা যেন আমাদের অভিন্ন বিশ্বাস, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আদর্শ এবং অভিন্ন ইতিহাস ও অভিন্ন স্বার্থের ভাইদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক কার্যকারণ

প্রাচ্যবাদকে অনুপ্রাণিত করার পেছনে অন্যতম প্রভাবক কার্যকারণ হলো, আমাদের সাথে পশ্চিমাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রতি আগ্রহ। যেন তারা তাদের পণ্যসামগ্রীর প্রসার করতে পারে ও আমাদের অশোধিত প্রাকৃতিক খনিগুলো নামেমাত্র মূল্যে ক্রয় করতে পারে। পাশাপাশি তারা যেন আরব ও মুসলিমপ্রধান দেশেগুলোর প্রতিষ্ঠিত শিল্প এবং উন্নয়নশীল বহু কারখানা ও কোম্পানিকে ধ্বংস করে স্থানীয় শিল্পগুলোকে ধ্বংস করতে পারে।

৪. রাজনীতিক কার্যকারণ

আরেকটি কার্যকারণ যা আমাদের আধুনিক যুগে আরব ও ইসলামি দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পর প্রকট হতে শুরু করেছে- আমরা দেখতে পাই পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিটি দূতাবাসে একজন সচিব কিংবা ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা থাকেন, যিনি আরবি ভাষায় দক্ষ। যাতে করে পশ্চিমারা আমাদের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনা ও মনোজগতকে অনুধাবন করে আমাদের মাঝে তাদের নিজ দেশের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের একটা সুযোগ ও সংযোগ তৈরি করতে পারে।

অতীতে অধিকাংশ সময় দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় দূতগণ যখন পশ্চিমের কেউ ছিলেন, তখন এই সংযোগের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। এখনও কতিপয় আরব ও ইসলামি দেশে এই ধারা জারি রয়ে গেছে। তারা ইসলামি ও আরব দেশগুলোতে কপটাচারের বিস্তার ঘটাচ্ছে আরব দেশগুলোর মাঝে এবং আরব ও ইসলামি দেশগুলোর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। এই কাজটি তারা সম্পাদন করেছে মেকি-হিতকামনার অজুহাতে। নতুবা পরস্পরে বিবাদমান দেশগুলোর কোনো একটি দেশের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ বিবাদমান কোনো একটি দেশের পক্ষাবলম্বন করে। পশ্চিমারা প্রাচ্যের ঐসব দেশের নেতৃবর্গের মানসিকতা ও গণরাজনীতিতে তাদের দুর্বল দিকগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার পরই তাদের পক্ষে এমনটা করা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ঔপনিবেশিক বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য বিভ্রান্তিকর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সম্পর্কে জানতেও ভোলেননি।[১১]

---

[১১] প্রাচ্যের মানুষদের মাঝে নিজেদের ক্ষমতাকে নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করা ছিল তাদের প্রধান কৌশল। একেই তারা নাম দিয়েছেন 'ডিভাইড এন্ড রুল' অর্থাৎ 'ভাগ কর, শাসন কর'। – আনুবাদক

৫. জ্ঞানতাত্ত্বিক কার্যকারণ

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে নিতান্তই নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি প্রাচ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষাসমূহকে নিরেট জানার জন্য প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আর এই নগণ্যসংখ্যক লোকেরাই ইসলাম ও তার জ্ঞান-সম্পদকে বোঝার ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম ভুলের শিকার হয়েছেন। কেননা তারা কপটতা ও তথ্যবিকৃতির ওপর বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তাদের গবেষণাগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচ্যবিদদের গবেষণার তুলনায় সত্য ও নিখুঁত প্র্যাকটিক্যাল পদ্ধতির অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে ওঠে।

উপরন্তু, তাদের কেউ কেউ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন ও ইসলামের রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যদিওবা এরূপ গবেষকদের দেখা পাওয়া খুব মুশকিল। কারণ, এরূপ নির্মোহ ও আন্তরিকতার সাথে প্রাচ্যবিদ্যার ওপর নির্বিঘ্নে ও অব্যাহতভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে হলে ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। যা তারা সহজে পান না। কারণ তাদের গবেষণাগুলো ছিল মোহমুক্ত। এতে থাকে না কোনো প্রথানুগমন। থাকে না ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং গতানুগতিক গবেষক ব্যক্তিবর্গের অনুগমন। তাই তাদের এ গবেষণা তাদের জন্য কোনো অর্থ সংস্থান কিংবা আর্থিক মুনাফা বয়ে আনে না। ফলে প্রাচ্যবিদদের মাঝে এরূপ গবেষকদের দেখা পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচ্যতত্ত্বের লক্ষ্য ও উপকরণাদি

সমগ্র প্রাচ্যতত্ত্বকে পাঠ করে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের লক্ষ্যসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১. অশুদ্ধ বা বিকৃত-জ্ঞানচর্চামূলক লক্ষ্য

যার লক্ষ্য হলো—

ক. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ ও বীতশ্রদ্ধতা সৃষ্টি করা। তাই দেখা যায় গরিষ্ঠসংখ্যক প্রাচ্যতাত্ত্বিক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্রষ্টা কর্তৃক ওহিপ্রাপ্ত নবি হওয়াকে অস্বীকার করেন।

সাহাবিদের— বিশেষত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সময়ে সময়ে দেখা ওহির অবতরণ-দৃশ্যাবলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচ্যবিদগণ উদ্ভট ও অবান্তর কথাবার্তা বলেন। অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে শুরু করেন। প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন 'মৃগীরোগ' হিসেবে। তারা বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে মৃগীরোগগ্রস্ত হতেন। আবার তাদের কেউ কেউ বলেছেন— এটা তার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মস্তিষ্কে ভরপুর ভাবালুতা ও কল্পনার ফল। কেউ কেউ এও বলেছেন— এটা তার একটা মানসিক ব্যাধি ছিল।

অনুরূপ আরও অনেক কিছুই তারা বলেছেন। যা শুনে মনে হয় যেন স্রষ্টা ইতোপূর্বে কোনো নবিকেই পৃথিবীতে পাঠাননি। যদ্দরুন ওহির অবতরণ দৃশ্যের ব্যাখ্যা করা তাদের জন্য নিতান্তই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদি ও খৃস্টান নির্বিশেষে প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ তাদের নিকট স্বীকৃত মূলনীতি, ইতিহাস-ইতিকথার আলোকে যখন জানতে পারলেন যে তাওরাতের নবিদের চেয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বেশি তখন তারা নিতান্তই বিদ্বেষবশত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছেন।

তাদের এ বিদ্বেষের উৎস ছিল তাদের অন্তরাকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামি। যা তাদের সন্ন্যাসী, মিশনারি ও ধর্মযাজক শ্রেণির লোকদের মতো অধিকাংশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদের মন ও মস্তিষ্কে ভরপুর ছিল। আর এই সূত্র ধরেই তারা অস্বীকার করে বলেন যে, কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ স্রষ্টাপ্রদত্ত গ্রন্থ নয়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এমন নিখুঁত ইতিহাস বলা অসম্ভব। তাই কুরআনে বর্ণিত পূর্বেকার জাতিগুলোর সত্য ইতিহাস দেখে যখন তারা নিরুত্তর-নির্বাক হয়ে যান, তখন তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার বহুত্ববাদী মূর্খদের মতো ধারণা করতে থাকেন যে— নিশ্চয় মুহাম্মাদ এমন কোনো লোকদের সহযোগিতা নিয়েছেন যারা এবিষয়গুলো তাকে অবগত করতো।

মোটকথা প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ এই বিষয়ে উদ্ভট কায়দায় অন্ধকারে আন্দাজের ঢিল ছুড়তে থাকেন। এরপর আবার যখন নিতান্তই অধুনালব্ধ জ্ঞানের আলোকে জানা কুরআনে বর্ণিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য তাদের নিরুত্তর করে দেয় তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাজওয়াব-মেধার তারিফ করেন। তখন এভাবে তারা নিপতিত হয় পূর্বের চেয়ে আরও ঘোরতর বিভ্রান্তিতে।

খ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও কুরআনের ঐশীতাকে অস্বীকার করার সূত্র ধরে তারা ইসলামকে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম হিসেবে অস্বীকার করে। তাদের কাছে ইসলাম, ইহুদি ও খৃস্টান ধর্মের সারনির্যাস। এক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমৃদ্ধ কোনো প্রমাণ নেই। এটা নিছক তাদের দাবি যা দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম ও উল্লিখিত ধর্মদ্বয়ের মাঝে সূক্ষ্ম কিছু সাদৃশ্য বা মিলের ওপর ভর করে।

উল্লেখ্য, গোল্ডজিহের ও শাখতের মতো ইহুদি প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা এ দাবি করতে অতিশয় আগ্রহী যে, ইসলাম ইহুদি ধর্মেরই সহযোগিতা নিয়েছে এবং এর প্রভাবই ইসলাম ধর্মে রয়েছে। আর খৃস্টান প্রাচ্যবিদগণ এদাবির ক্ষেত্রে ইহুদিদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। কারণ খৃস্টবাদে এমন কোনো বিধান নেই যেটার ব্যাপারে অন্তত এতটুকু ধারণা করা যেতে পারে যে, ইসলাম এই বিধান দ্বারা প্রভাবিত ও এটা থেকে ইসলাম কিছু গ্রহণ করেছে। তবে খৃস্টবাদে রয়েছে এরূপ কিছু চারিত্রিক মূলনীতি যা দেখে তাদের এরূপ ভ্রম হতে পারে যে, এটা ইসলামকে প্রভাবিত করেছে ও খৃস্টবাদ থেকে এটা ইসলামে এসেছে। তাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা এমন স্বতঃসিদ্ধ বিধান বানিয়ে নিয়েছেন যে, ঐশী ধর্মগুলোর চারিত্রিক মূলনীতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হওয়া এবং সর্বোপরি এগুলোর স্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন হওয়াও আবশ্যক। (অর্থাৎ তারা ধরে নিয়েছেন, যে-স্রষ্টা ইসলাম ধর্ম সৃষ্টি করেছেন তিনি অপরাপর ধর্মগুলো সৃষ্টি করেননি। অন্য কেউ করেছেন) অথচ স্রষ্টা সম্পর্কিত তাদের এরূপ গর্হিত বক্তব্যের চেয়ে স্রষ্টা যোজন যোজন ঊর্ধ্বে।

গ. আমাদের সত্যসন্ধ বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা করা হাদিসের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ হাদিসে প্রবিষ্ট বানোয়াট ও চক্রান্তমূলক বক্তব্যের দোহাই দিয়ে গলাবাজি করেন। বিশেষজ্ঞরা হাদিসের প্রামাণিকতা ও সঠিকত্বের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করে বিশুদ্ধ হাদিসকে বাছাই করার যে মহান কর্মযজ্ঞ চালিয়েছেন, সেই কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে জেনেও না জানার ভান করেন। যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অথচ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোর বিশুদ্ধতার প্রতি নিশ্চয়তার জন্য বা আস্থাশীল হওয়ার জন্য এর দশভাগের একভাগের আশাও করা যায় না। এবিষয়ে আমি আমার সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা'[১২] নামক গ্রন্থে তাদের বিশ্বাসের প্রমাণনির্ভর পর্যালোচনা করেছি।

বলাবাহুল্য, প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা এই দাবি-প্রতিষ্ঠার অগম্যগমনে প্রলুব্ধ হওয়ার কারণ হলো, তারা দেখলেন আমাদের বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে, রাসুলের হাদিস অপরিমেয় মননশীলতা ও বিস্ময়কর সব বিধানাবলিতে পরিপূর্ণ । তারা যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতে বিশ্বাসী নন তাই তারা দাবি করে বসলেন যে– "হাদিসগুলোর সব নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটা ধারণাতীত। বরং এটা প্রথম তিন শতাব্দীর মুসলিমদের কাজ।"

---

[১২] অর্থাৎ, আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিইল ইসলামি।

তাই বলা যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতকে স্বীকার না করাটাই তাদের মনন ও চিন্তার প্রতিবন্ধকতা বা চৈন্তিক জড়তা ছিল। এর থেকেই সমুদয় উদ্ভট ও ভ্রমাত্মক চিন্তার উৎপত্তি।

ঘ. স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামি ফিক্‌হ বা ইসলামি বিধানের মাহাত্ম্যের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। যা একটি বিস্ময়কর বিধান। যার মতো বিধান পৃথিবীর কোনো যুগেই কোনো জাতি সংকলন করতে পারেনি। প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ ইসলামি বিধানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্ময়াভিভূত হলেন ঠিকই– কিন্তু যেহেতু তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী না, তাই তাদের সামনে এরূপ ধারণার পথই খোলা রইল যে, এই মহান আইনশাস্ত্র বা বিধান রোমান আইনের অনুকরণে রচিত। অর্থাৎ পশ্চিমাদের অনুকরণে রচিত।

আমাদের অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ এই দাবির অন্তঃসারশূন্যতার ওপর বিশদ আলোচনা করেছেন। এছাড়াও দা হেইগ (THE HAGUE) সিটিতে অনুষ্ঠিত তুলনামূলক আইনশাস্ত্রের কনফারেন্সে ঘোষণা করা হয়–"ইসলামি আইন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন। এতে অন্য কোনো আইনের অনুকরণ নেই।" সেদিনের এ ঘোষণা চরমভাবাপন্ন বিদ্বেষপরায়ণদের লা-জওয়াব করে দিয়েছে এবং সেসব ন্যায়পরায়ণদের সন্তুষ্ট করে দিয়েছে যারা সত্যের পথে চলতে ভালোবাসেন।

ঙ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবর্তনের সাথে আরবি ভাষার তাল মিলিয়ে চলতে পারে, এই ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। যেন আমরা আমাদের ওপর তাদের সাহিত্যিক আধিপত্য ও তাদের আভিজাত্যজ্ঞাপক আধুনিক পরিভাষাগুলোর সামনে অসহায় হয়ে থাকি এবং আরবি সাহিত্যের সমৃদ্ধিশীলতার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করি। তাদের সাহিত্যের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করার জন্য তারা আরবি সাহিত্যকে অনুর্বর ও নিঃস্ব সাহিত্য হিসেবে জাহির করেন। আর এটাই হলো সাহিত্যিক ঔপনিবেশিকতা। তাদের চলমান সামরিক ঔপনিবেশিকতার পাশাপাশি এই সাহিত্যিক ঔপনিবেশকতার ইচ্ছাও তারা পোষণ করতেন।

এগুলোই হচ্ছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য। যা হাসিলের জন্য তাদের অধিকাংশ লোক বা নৈরাজ্যপরায়ণ গরিষ্ঠসংখ্যক লোক শ্রম দিয়েছেন।

২. ধর্মীয় ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য

যার সারনির্যাস হলো—

ক. মুসলিমদের নবি, কুরআন, বিধি-বিধান ও শরিয়তের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এতে ধর্মীয় ও ঔপনিবেশিক দুটি উদ্দেশ্যই সফল হয়।

খ. মুসলিমদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা। আর তাই তারা দাবি করলেন ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে রোমান সংস্কৃতির অনুকৃতি বা নকল। আরব ও মুসলিমরা রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির দর্শন ও সাহিত্যের নিছক অনুকারক। তাদের কোনো সাংস্কৃতিক ও মননশীল প্রতিভা নেই। তাদের সভ্যতায় ছিল যাবতীয় অসম্পূর্ণতা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা যদিও কখনো আরব ও মুসলিমদের সংস্কৃতির গুণকীর্তন করেন (অবশ্য তারা এটা খুব কমই করেন) তাহলে তারা তা বহুকষ্টে নিতান্তই অসম্পূর্ণতার সাথে উল্লেখ করেন।

গ. মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য পূর্বসূরিদের জ্ঞান-সম্পদকে অবমূল্যায়ন করা এবং মুসলমানদের কাছে থাকা পূর্বসূরিদের যাবতীয় মূল্যবান রচনাকর্ম, তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও চারিত্রিক অতুলনীয়তার ব্যাপারে সন্দেহের প্রবণতা তৈরি করা। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের ওপর পশ্চিমের ঔপনিবেশিকতার থাবাকে আরও দৃঢ় করা এবং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসারকে ত্বরান্বিত করা। যাতে মুসলিমরা তাদের সভ্যতার দাসত্ব বরণ করে নেয় এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি ভালোবাসা পশ্চিমাদের প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়। অথবা বলা যায়, মুসলিমদের অন্তরের প্রতিরোধ-প্রবণতাকে দুর্বল করাও ছিল অন্যতম অনুঘটক বা কারণ।

ঘ. ইসলামপূর্ব যুগে মুসলিমদের মধ্যকার স্বাজাত্যবোধ, মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বাদ-বিবাদকে পুনর্জীবিত করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যকার ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধকে নিষ্প্রাণ করে তুলে। তদ্রূপ তারা আরব দেশগুলোতেও এমনটাই করছে। তারা তাদের সত্য বিকৃতিপ্রবণ মেধাশক্তিকে সর্বপ্রকার নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুসলিমদের একতাবদ্ধতা ও ঐকমত্য সৃষ্টিতে বাধসাধতে। আরব ভূখণ্ডগুলোর একতাবদ্ধতা এবং আরবের জনসাধারণের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণের চিন্তা-চেতনাকে পশ্চিমাদের মনমতো চালিত করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে তারা ইতিহাসকে নতুন করে লেখেন। ইতিহাসের এই বিকৃত বয়ানটি তারা তৈরি করেছেন ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করে এনে একত্রে লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে।

৩. নিখাদ জ্ঞানচর্চামূলক লক্ষ্য

যার উদ্দেশ্য নিছক গবেষণা ও অনুসন্ধান–

নিতান্তই নগণ্যসংখ্যক হলেও প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের একাংশ আরব ও ইসলামি উত্তরাধিকার বা জ্ঞান-সম্পদের অধ্যয়ন করে নিজেদের অনেক গোপন ও চেপে রাখা সত্য সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছেন। তারা নিজেদের গবেষণা ও অধ্যয়নে আন্তরিক থাকা সত্ত্বেও সত্য থেকে দূরবর্তী সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। এর পিছনে দুটি কারণ হতে পারে– হয়তো তারা আরবি ভাষার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। আর না হয় তারা ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত আবহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তারা তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যেভাবে ইতিহাসের চিত্রায়ণ করেছেন সেভাবে চিত্রায়ণেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। ভুলে গেছেন প্রকৃতিগত, সত্ত্বাগত ও কালগত বিভিন্নতা বা পার্থক্যের কথা। এসব বিভিন্নতা বা পার্থক্যগুলোই আমাদের পঠিত ইতিহাসের আবহ ও আমাদের জীবনযাপনের চলমান ও বাস্তব আবহের মাঝে বিরাট ফারাক তৈরি করে দেয়।

লক্ষ্যের দিক থেকে এই দলটিই উপর্যুক্ত তিনটি দলের ভেতর সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। কেননা প্রকৃত সত্যটি তাদের কাছে উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই তারা সত্যের পথে ফিরে আসেন। তাদের মাঝে যে ব্যক্তিটি মন ও মননে গবেষ্য পরিবেশের আবহে একাকার হয়ে বসবাস করে সে-ই সত্য ও বাস্তবের অনুকূল সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। কিন্তু পূর্বোক্ত দ্বিবিধ লক্ষ্যের (অশুদ্ধ বা বিকৃত-জ্ঞানচর্চামূলক লক্ষ্য এবং ধর্মীয় ও রাজনীতিক লক্ষ্য) অনুগামীদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষের শিকার হতে হয় এই শ্রেণির গবেষকদের।

তাই পূর্বোক্ত লক্ষ্যদ্বয়ের অনুগামীরা তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করেন যে, তারা গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন, তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছেন, মুসলিমদের প্রতি তাদের বিশেষ সৌজন্যবোধ ও দুর্বলতা রয়েছে এবং তারা মুসলিমদের নৈকট্য অর্জন বা মন জয় করার জন্য এমন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। যেমনটা তারা টমাস আর্নল্ডের সাথে

করেছেন। যখন তিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ 'ইসলামের প্রতি আহ্বানে'[১৩] মুসলিমদের প্রতি ইনসাফ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে মুসলিমদের ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি উদারতার প্রমাণনির্ভর আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভিন্নমতাবলম্বীরা মুসলিমদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও মুসলিমরা উদারতা দেখিয়েছে। এই গ্রন্থটিকে বলা হয় ইসলামের ধর্মীয় উদারতার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ। অথচ এ বইটি সম্পর্কেই প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা এবং বিশেষত মিশনারিরা নিন্দার ঝড় তোলেন। তারা বললেন— 'টমাস আর্নল্ড মুসলমানদের ওপর তার ভালোবাসা ও সম্প্রীতির দরুন তীব্র প্রতিক্রিয়াশীলতায় অন্ধ ছিলেন।' যদিও তিনি প্রত্যেকটি ঘটনা বা ঐতিহাসিক উপাদানকেই দলিলসহ উল্লেখ করেছেন।

আশার কথা হলো, পশ্চিমা বিদ্বৎসমাজে কতক এমন ব্যক্তিও রয়েছেন— যাদের সত্যান্বেষণ ও গবেষণার নিখাদ মনোবৃত্তি তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে ও ইসলামের পক্ষে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যার উদাহরণ হলেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ চিত্রশিল্পী দিনেত। যিনি আলজেরিয়ায় বসবাসকালে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তার নাম রাখা হয় নাসিরুদ্দিন দিনেত। তিনি আলজেরিয়ার এক গবেষকের সাথে যৌথভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তার আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম 'ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত আলোকমালা'।[১৪] এই বইয়ে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের প্রতি পশ্চিমাদের অবিচার নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এই মুসলিম প্রাচ্যবিদ ফ্রান্সে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে দাফন করা হয় আলজেরিয়ায়।

---

[১৩] লেখক এখানে টমাস আর্নল্ডের (১৮৬৪-১৯৩০) "দা প্রিচিং অব ইসলাম"-এর কথা বলছেন।
[১৪] আশি'আতুন খাসসাতুন বিনুরিল ইসলাম

প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের লক্ষ্য অর্জনের উপকরণসমূহ

প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা তাদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসার করার জন্য এমন কোনো উপকরণ নেই যা তারা অবলম্বন করেননি।

১. প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা ইসলাম, ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। **এসব গ্রন্থের অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর বিকৃত উদ্ধৃতি দ্বারা ও উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ গ্রন্থগুলোতে আরও ছিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিকৃত জ্ঞান ও তা থেকে উৎসারিত বিকৃত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত।**

২. তারা ইসলাম, ইসলামিক ভূখণ্ড ও তার সমাজসংক্রান্ত গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৩. মুসলিম বিশ্বে মিশনারি তৎপরতার প্রসার ঘটান। যা বাহ্যত মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড। যেমন- হাসপাতাল, সাহায্য-সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শরণার্থী শিবির, অনাথাশ্রম এবং 'খৃস্টান যুবসমাজ সংঘের মতো অতিথিশালা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও জ্ঞানভিত্তিক সংস্থাগুলোতে বক্তৃতা প্রদান করেন। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইসলামবিদ্বেষী ও ইসলামের অনিষ্টকামী ব্যক্তিটিই কায়রো দামেশ্‌ক বাগদাদ রাবাত লাহোর করাচি আলিগড় ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামি ও আরবি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন।

৫. স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তবে তারা আমাদের ভূখণ্ডগুলোর পত্র-পত্রিকার স্বত্বক্রয়ের জন্যও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। যেমনটা ড. উমর ফাররুখ ও ড. মুস্তফা আল-খালিদি লিখিত গ্রন্থ 'মিশনারি তৎপরতা ও উপনিবেশবাদে'[১৫] উল্লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিয়োজিত প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ও

[১৫] আত-তাবশির ওয়াল ইসতিমার

মিশনারিদের তৎপরতার ওপর রচিত সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনাকর্ম। ড. উমর ফাররুখ ও মুস্তফা আল-খালিদি লিখেন—

> "মিশনারিরা ঘোষণা করেন যে, তারা যেসব দেশে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সেসব দেশের মধ্য থেকে সবিশেষভাবে মিসরীয় পত্রপত্রিকাগুলোকেই খৃস্টীয় মতবাদ প্রচার-প্রসারের জন্য সমধিক মোক্ষ অস্ত্র মনে করেন। তাই মিসরীয় বহু পত্র-পত্রিকায় তাদের অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ সময় তাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এর অন্যথা খুব কমই হয়েছে।"

৬. বিভিন্ন কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। **যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা। কিন্তু বাহ্যত মনে হতো তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণা ও আলোচনাকে ব্যাপক করা।** ১৭৮৩ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তারা নিয়মিতভাবে তাদের এ কনফারেন্স আয়োজনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

৭. 'দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া' নামক বিশ্বকোষ রচনা করেন। যে বিশ্বকোষটি কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এর নতুন সংস্করণ প্রকাশও রীতিমত শুরু হয়ে গেছে। ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ড পরিদর্শনকালে আমি বিশ্বকোষটির সম্পাদকের কল্যাণে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম অংশগুলো দেখার সুযোগ পাই। বিশ্বকোষটির প্রথম সংস্করণের আরবি ভাষান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। এর ১৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশ্বকোষটি রচনার জন্য ইসলামের প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশি বিদ্বেষপরায়ণ ও দাপুটে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের একত্রিত করা হয়েছে। শর্ষের ভিতরেই ভূত! তাই তো ইসলাম ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের অবান্তর তথ্যে ভরে ওঠে বিশ্বকোষটি। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের অনেক স্কলাররা এ বিশ্বকোষটিকে আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা এ বিশ্বকোষে বর্ণিত তথ্যকে প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করে। এ বিশ্বকোষটি মূলত ঐসব স্কলারদের ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।

এই হলো প্রাচ্যবিদদের শ্রেণিবিভাগ, লক্ষ্য ও উপকরণাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। আমাদের মনে হয়, এখানে আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে যারা অধিকতর মারাত্মক ও বিপজ্জনক তাদের নিয়ে আলোচনা করা দরকার। পাশাপাশি অখণ্ড ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলোতে প্রকাশিত প্রাচ্যবিদদের উল্লেখযোগ্য বইসমূহ ও পত্র-পত্রিকাসমূহের উল্লেখ পাঠকদের সম্যক উপকৃত করবে।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা[১৬]

ক. ১৭৮৭ সালে ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮২০ সালে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই তারা 'এশীয় পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

খ. ১৮২৩ সালে লন্ডনে প্রাচ্যতত্ত্বকে উৎসাহিত করার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও দেখভাল তখনও শুরু করেনি। তা সত্ত্বেও সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় 'রাষ্ট্রীয় এশিয়াবিষয়ক সংস্থার পত্রিকা'।

গ. ১৮৪২ সালে মার্কিনিরা একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন 'মার্কিনি প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক সংস্থা' নামে। ওই সালেই জার্মানি প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে তারা অস্ট্রিয়া, ইতালি ও রাশিয়াতেও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন।

---

[১৬] এই অধ্যায়ে প্রযুক্ত পত্র-পত্রকিা এবং সামনের অধ্যায়ে প্রযুক্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের তালিকা ও রচনাবলির তথ্য ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বাহি'র একটি বক্তৃতার সাহায্যে রচিত হয়েছে। বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিল, আল মুবাশশিরুন ওয়াল মুস্তাশরিকুন ওয়া মাওকিফুহুম মিনাল ইসলাম। – লেখক

ঘ. মার্কিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা এই শতাব্দীতে যে-পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তা হলো 'প্রাচীয়-গবেষণামূলক সংস্থার মুখপত্র'। যেটা ওহিয়োর গাম্বিয়া শহরে প্রকাশিত হতো। আর লন্ডন, প্যারিস, লিপজিগ ও কানাডার টরন্টোতে এর শাখা-উপশাখা রয়েছে। তবে এখনো ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হয় কি না তা জানা যায় না। সবসময় দেখা যায় এই পত্রিকার সাধারণ চারিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক প্রাচ্যতত্ত্বের চারিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। যদিওবা কখনো কখনো কতিপয় ধর্মীয় জটিলতাকেও তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের আলোচনার মাধ্যমে।

ঙ. আধুনিক যুগে মার্কিন প্রাচ্যবিদরা প্রকাশ করেন 'মধ্যপ্রাচ্যের হালচালের মুখপত্র' নামক পত্রিকা। অনুরূপভাবে 'মধ্যপ্রাচ্যের মুখপত্র' নামক পত্রিকাও প্রকাশ করেন তারা। সধারণত এই পত্রিকাগুলোর চারিত্র্যও রাজনৈতিক প্রাচ্যতত্ত্বের চারিত্র্য।

চ. সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী যে পত্রিকাটি আধুনিক যুগে মার্কিন প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা প্রকাশ করে থাকেন তা হলো 'মুসলিম বিশ্ব' অর্থাৎ 'THE MOSLEM WORLD'। এ পত্রিকাটি ১৯১১ সালে সামুয়েল যেমার (SAMUEL ZWEMER) প্রতিষ্ঠা করেন। এটা এখন প্রকাশিত হয় আমেরিকার হার্টফোর্ড থেকে। যার সম্পাদক হলেন কে. গ্র্যাগ। এ পত্রিকার চারিত্র্য হচ্ছে পারিযায়ী মিশনারি বা বিশ্বব্যাপী মিশনারি কার্যক্রম।

ছ. ফরাসি প্রাচ্যতাত্ত্বিকরাও মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অনুরূপ মিশনারি-বিদ্বেষপূর্ণ প্রাণোদ্দাম ও দৃষ্টিভঙ্গি-চালিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার নাম ও ছিল 'মুসলিম বিশ্ব' (LE MONDE MUSULMAN)

অপেক্ষাকৃত বিধ্বংসী আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নাম ও তাদের উল্লেখযোগ্য রচনাবলি।

এ. জে. আরবেরি (A. J. ARBERRY)

ইংরেজ চিন্তাবিদ, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থী মনোভাবের জন্য প্রসিদ্ধ। 'দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া' নামক বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক। বর্তমানে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োজিত আছেন। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ইসলামি স্টাডিজ ও আরবি ভাষার ওপর ইংল্যান্ড থেকে স্নাতক অনেক মিসরীয়র শিক্ষাগুরু তিনি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে—

১. বর্তমান সময়ে ইসলাম[১৭], ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত।
২. তাসাওউফের (আত্মশুদ্ধিচর্চা) ইতিহাসের ভূমিকা[১৮], ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।
৩. তাসাওউফ, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।
৪. কুরআনের অনুবাদ, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত।

---

[১৭] আল-ইসলাম আলইয়াওমা

[১৮] মুকাদ্দিমাতুন লি তারিখিল ইসলামি।

আলফ্রেড গোয়ম (A. GEOM)[১৯]

সমসাময়িক ইংরেজ চিন্তাবিদ। ইসলামের বিপক্ষে চরমপন্থী মনোভাব পোষণের জন্য প্রসিদ্ধ। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দেন। তার রচনা ও চিন্তা-চেতনায় মিশনারি মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'ইসলাম'। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, মিসরের সরকারের উদ্যোগে যেসব শিক্ষার্থীদের প্রাচ্যের ভাষার ওপর গ্রাজুয়েশনের জন্য প্রেরণ করা হয় তাদের অনেকেরই শিক্ষাগুরু তিনি।

বারোন গারা দ্য ফো (BARON GARRA DE VAUX)

ফরাসি চিন্তাবিদ, ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে চরমবিদ্বেষী। তিনি 'দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া'র সম্পাদনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

এইচ. এ. আর. গিব (H.A.R. GIBB)

ইংল্যান্ডের আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রধানতম। তিনি মিসরের 'ভাষা একাডেমি'র সদস্য ছিলেন। বর্তমানে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামি গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক। দাইরাতুল মাআরিফের প্রধানতম প্রকাশক ও সম্পাদকদের অন্যতম। তার বহু রচনা রয়েছে। যাতে তার অনবদ্য পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। আর এটাই তার মানোত্তীর্ণতার রহস্য। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে–

১. 'ইসলামের পথ' বা 'তরিকুল ইসলাম' বইটি তিনি অন্যান্য গবেষকদের সহযোগে রচনা করেন। যেটা আরবি ভাষাতে উপর্যুক্ত শিরোনামে ভাষান্তরিত হয়েছে।

২. আল ইত্তিজাহাতুল হাদিসাহ ফিল ইসলাম বা ইসলামে আধুনিক চিন্তাধারা। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এর পুনর্প্রকাশও হয় এবং ওই শিরোনামেই তা আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।

৩. মুহাম্মাদের (সা.) মতাদর্শ, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং একাধিক মুদ্রণও বের হয়।

৪. ইসলাম ও পশ্চিমা সমাজ, কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি একটি যৌথ রচনাকর্ম। এছাড়াও তার আরও বিবিধ রচনা রয়েছে।

---

[১৯] তার মূল নাম Alfred Guillaume (1888-1965) তবে লিপিকার সম্ভবত ভুলবশত উপর্যুক্ত বানানে লেখেছেন।

গোল্ডজিহের (GOLDZIHER)

হাঙ্গেরীয় চিন্তাবিদ, ইসলাম বিদ্বেষিতা ও ইসলাম বিষয়ে স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর জন্য সুপরিচিত। দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়ার অন্যতম সম্পাদক। লিখিছেন কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'তারিখু মাযাহিবিত্তাফাসিরিল ইসলামিয়া' বা 'ইসলামি ভাষ্যের মতবাদগুলোর ইতিবৃত্ত'। বইটি আরবিতে ভাষান্তরিতও হয়েছে ওই শিরোনামে।

জন মায়নার্ড (JOHN MAYNARD)

চরমপন্থী মার্কিন চিন্তাবিদ। তিনি আমেরিকার 'প্রাচ্যীয় গবেষণা সংস্থার মুখপত্র'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তার আরাধ্য মিশনকে বোঝাতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হয় না। বিশেষভাবে ইসলাম-সংশ্লিষ্ট নতুন বইগুলোর বেলায় এবং শিথিলভাবে প্রাচ্য-সংশ্লিষ্ট নতুন বইগুলোর ক্ষেত্রে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ঐ পত্রিকার ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের ৮ নং ভল্যুমের দ্বিতীয় সংখ্যার ২২ নং পৃষ্ঠা ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।)

এস. এম. যেমার (S.M. ZWEMER)

মিশনারি প্রাচ্যবিদ। উগ্র ইসলাম বিদ্বেষের জন্য তিনি সুবিখ্যাত। মিশনারি মার্কিন পত্রিকা 'মুসলিম বিশ্বে'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইসলামের মতাদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ' নামক গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। ভারতের লখনৌ শহরে ১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মিশনারি সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধমালার 'ইসলাম' নামক সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশকও ছিলেন আলোচ্য লেখক। মার্কিনিরা তার অবদান ও কর্মধারার স্বীকৃতিস্বরূপ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ও মিশনারি-প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে তার নামে একটি ওয়াক্‌ফ এস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন।

আযিয আতিয়া সুরয়াল (AZIZ ATIYA SURYAL)

খৃস্টান মিসরীয় চিন্তাবিদ। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। বর্তমানে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চরমভাবে পরশ্রীকাতর। ইসলামি আদর্শের বিকৃত-প্রচারণা বা বিকৃতিসাধনে সিদ্ধহস্ত। মিসর ও মুসলিমদের থেকে দূরে অবস্থানের ফলে তার এই হিংসাপরায়ণতা বা পরশ্রীকাতরতা এবং বিকৃতিসাধনে ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়। ক্রুসেড যুদ্ধ সম্পর্কে তার কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে।

জি. ভন গ্রোনবাউম (G. VON. GRUNBAUM)

বংশগতভাবে জার্মান ইয়াহুদি। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। পরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার জন্য তাকে নিয়ে আসা হয়। ইসলাম ধর্মের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্নদের অন্যতম। তার সকল গ্রন্থে রয়েছে মুসলিম ও ইসলামের মূল্যবোধের ওপর অবান্তর-উদ্ভট তত্ত্বারোপ ও শত্রুসুলভ উৎকট মনোভাব। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনেকেই তার ভক্ত-অনুরাগী। তার রচনার পরিমাণ বিপুল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে—

১. মধ্যযুগীয় ইসলাম,[২০] ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত।
২. মুহাম্মাদি উৎসবসমূহ,[২১] ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।
৩. ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যার প্রয়াসসমূহ,[২২] ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত।
৪. ইসলামি সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চা,[২৩] ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত।
৫. ইসলাম, বিবিধ প্রবন্ধের সংকলন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত।
৬. ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ,[২৪] ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত।

ফিলিপ হিট্টি (PH. HITTI)

লেবাননি খৃস্টান। পরবর্তীতে আমেরিকায় বসবাস করেন। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ঐ বিভাগের প্রধান হন। অদ্যাবধি ঐ পদেই বহাল রয়েছেন। ইনি ইসলামের ঘোরতর অনিষ্টকামীদের গোত্রভুক্ত এবং আমেরিকায় আরব্য আইন সংরক্ষণের নাটক সাজান। তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বেসরকারি উপদেষ্টা ছিলেন। বরাবর তার ধ্যান-জ্ঞান ছিল ইসলামি ভূখণ্ডগুলোতে মানবতাভিত্তিক সভ্যতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা এবং ইসলামকে কোনো প্রকার কৃতিত্ব প্রদানে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। উদাহরণত, তিনি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'আমেরিকান বিশ্বকোষ'র[২৫] 'আরবি সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন—

---

[২০] ইসলামুল উসুরিল উসতা
[২১] আল আইয়াদুল মুহাম্মাদিয়া
[২২] মুহাওয়ালাতুন ফি শারহিল ইসলামিল মুআসির
[২৩] দিরাসাতুন ফি তারিখিস সাকাফাতিল ইসলামিয়া
[২৪] আল ওয়াহদাতু ওয়াত তানাউ ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়া
[২৫] লেখক এখানে আরবি নাম উল্লেখ করেছেন– দাইরাতুল মাআরিফিল আম্রিরিকিয়া। আরবি ভাষায় এই নামে কোনো বিশ্বকোষের হদিস আমরা পাই নি। অনুমিত হয়, এই আরবি নামটি ইংরেজি নামটির আক্ষরিক আনুবাদ। লেখক এখানেও অপরাপর আরব গবেষকদের মতো ভিনভাষার নামকে আরবিতে নামান্তর করেছেন।

> "প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের শেষ ভাগেই নতুন সাহিত্যিক ধারার লক্ষণগুলো প্রকাশ হতে শুরু করে। এই নতুন আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের অধিকাংশই ছিলেন লেবাননের খৃস্টানরা। যারা আমেরিকার খৃস্টধর্মের প্রচারকদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বদৌলতে শিক্ষাদীক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন।"

হিট্টির এরূপ কপটাচার কেবল আধুনিক যুগের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামি ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়কালেই এর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। যা তার বইয়ে খুবই স্পষ্ট। আমরা এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি।

১. 'আরবের ইতিহাস'[২৬] ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত। বহুবার এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এই বইটি ইসলামের কুৎসা ও ইসলামের নবির বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। যা নিতান্তই তার পরশ্রীকাতরতা, অন্তরস্থিত বিষবাষ্প ও উন্নাসিকতার বহির্প্রকাশ। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত 'AL-ISLAM' নামক ইংরেজি পত্রিকার ১৯৫৮ সালের এপ্রিল সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৩৮ এবং ঐ সালের মে মাসের প্রথম সংখ্যার ১৪৬ পৃষ্ঠা।

২. সিরিয়ার ইতিহাস।[২৭]
৩. দুরুজদের মূল ও তাদের ধর্মবিশ্বাস।[২৮] ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

এ. জে. ওয়েনসিংক (A. J. WENSINK)

ইসলাম ও ইসলামের নবির চরমভাবাপন্ন শত্রু। মিসরীয় ভাষা একাডেমির সদস্য ছিলেন। পরে ডা. হুসাইন আল-হারাবি কর্তৃক সৃষ্ট জটিলতার দরুন সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন। বলে নেয়া ভালো, হুসাইন আল হারাবি[২৯] হচ্ছেন 'প্রাচ্যবিদগণ ও ইসলাম'[৩০] নামক গ্রন্থের রচয়িতা। যেটা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই বহিষ্কারের ঘটনা তখনই ঘটে যখন ওয়েনসিংকের প্রকৃত মতাদর্শ প্রকাশ পেল। অর্থাৎ তিনি দাবি করে বসলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী দার্শনিক ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের সারনির্যাস থেকে কুরআন রচনা করেছেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, 'প্রাচ্যবিদগণ ও ইসলামে'র ৭১ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা। 'ইসলামের মতাদর্শ' নামক ওয়েনসিংকের একটি বই খুব প্রসিদ্ধ, যা ১৯৩২ সালে প্রকাশিত।

---

[২৬] দা হিস্ট্রি অব আরব। লেখক এখানে আরবি নামটি উল্লেখ করেছেন।
[২৭] তারিখু সিরয়া
[২৮] আসলুদ দুরুজ ওয়া দিয়ানাতুহুম।
[২৯] মূল বইয়ে 'হাওয়ারি' লেখা হয়েছে। বোধকরি এটা লিপিকারের ভুল।
[৩০] আল মুসতাশরিকুন ওয়াল ইসলাম

কে. গ্র্যাগ (K. GRAGG)

মার্কিন চিন্তাবিদ। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে অতিমাত্রায় কট্টরপন্থী। কায়রোর আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে মার্কিন মিশনারি পত্রিকা 'মুসলিম বিশ্বে'র প্রধান সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও তিনি হার্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের খৃস্ট ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ও মিশনারিদের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি। 'মিনারের আহ্বান' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত।

লুই. মাসিনোন (L. MASSIGNON)

ফ্রান্সের আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মাঝে প্রধানতম। ফরাসি সম্রাজ্যের দক্ষিণ আফ্রিকাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। মিসরস্থ ফরাসি মিশনারি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতাও ছিলেন তিনি। ইসলামি বিভিন্ন দেশে তিনি একাধিকবার সফর করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পাঁচ বছর ফরাসি বাহিনীর সেবা করেন। মিসরীয় ভাষা একাডেমি ও দামেশকের আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য ছিলেন। দর্শন ও ইসলামি আধ্যাত্মিক চর্চার ওপর তিনি ডক্টরেট করেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা– 'ইসলামের স্বার্থে শহিদ সুফি হাল্লাজ'। ১৯২২ সালে প্রকাশিত। এছাড়াও তার দর্শন ও তাসাওউফের ওপর আরও রচনা ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। তিনি দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া বা ইসলামি বিশ্বকোষের অন্যতম প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড (D. B. MACDONALD)

মার্কিন চিন্তাবিদ। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতায় অতিশয় কট্টরপন্থীদের দলভুক্ত। তার রচনাকর্মে চিরাচরিত ও সহজাত মিশনারি মনোভাবের বহির্প্রকাশ ঘটে। 'ইসলামি বিশ্বকোষ'র অন্যতম প্রধান সম্পাদক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো–

১. ফিকহ ও ইলমে কালামের বিবর্তন এবং ইসলামে আইনি (সাংবিধানিক) দৃষ্টিভঙ্গি[৩১]। প্রকাশিত ১৯০৩ সাল।

২. ইসলামে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনাচার,[৩২] ১৯০৮ সালে প্রকাশিত।

---

[৩১] তাতাওউরু ইলমিল কালাম ওয়াল ফিকহি ওয়ান নাজরিয়্যাতুদ দাসতুরিয়া ফিল ইসলাম।

[৩২] আল মাওকিফুদ দিনি ওয়াল হায়াতু ফিল ইসলাম

এম. গ্রিন (M. GREEN)

তিনি ছিলেন 'মধ্যপ্রাচ্য' পত্রিকার সহকারী পরিচালক।

মাজিদ খাদ্দুরি [৩৩](MAJID KHADDURI)

ইরাকি খৃস্টান। ওয়াশিংটনস্থ জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং 'মধ্যপ্রাচ্যীয় গবেষণা ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক সংস্থা'র পরিচালক। ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি অতীব হিংসাপরায়ণ ও একজন চরমপন্থী গবেষক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তি'। এই বইটি ইসলামের কুৎসা ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। এছাড়াও তার আরও অনেক রচনা রয়েছে।

ডি. এস. মারগোলিয়ুস (D. S. MARGOLIOUTH)

ইংরেজ চিন্তাবিদ, ইসলামের চরম বিরোধী। 'ইসলামি বিশ্বকোষে'র অন্যতম সম্পাদক। মিসরীয় ভাষা একাডেমি ও দামেশকের গবেষণা একাডেমির সদস্য ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি–

১. ইসলামে প্রাথমিক উদ্বর্তন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত।
২. মুহাম্মাদ (সা.) এবং ইসলামের সূচনাপর্ব। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত।
৩. ইসলামি পাঠশালা। ১৯১২ সালে প্রকাশিত।

আর. এ. নিকলসন (R. A. NICKOLSON)

ইংল্যান্ডের আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রধানতম। 'ইসলামি বিশ্বকোষে'র অন্যতম সম্পাদক। তিনি ইসলামি আধ্যাত্মচর্চা ও দর্শনের ওপর গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। মিসরীয় ভাষা একাডেমির সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামকে আধ্যাত্মিক ধর্ম হিসেবে অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত। ইসলামকে তিনি আখ্যা দেন বস্তুবাদী ধর্ম হিসেবে এবং মানবিক উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক হিসেবে। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো–

১. ইসলামের আধ্যাত্মচর্চাকারীগণ। প্রকাশিত ১৯১০ সালে।
২. আরবের সাহিত্যিক ইতিহাস। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত।

---

[৩৩] মূল বইয়ে কাদুরি লিখিত হয়েছে, যা সঠিক নয়।

হার্ভলি হল (H. P. HALL)

'মধ্যপ্রাচ্য' নামক মার্কিন পত্রিকার সম্পাদক। তার অনন্যতা হলো, আধুনিক যুগে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পত্রিকাটির তিনি রাজনৈতিক নির্দেশক।

হেনরি লামেন্স (H. LAMMENS)

ফরাসি চিন্তাবিদ। 'ইসলামি বিশ্বকোষে'র অন্যতম সম্পাদক। প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তিনি ইসলাম-বিদ্বেষিতা ও অবান্তর তথ্য উপস্থাপনায় এমন মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, স্বয়ং প্রাচ্যতত্ত্ববিদরাই তার এহেন কর্মে বিব্রত ও লজ্জিতবোধ করেন। (প্রমাণস্বরূপ দেখুন, আমেরিকার 'প্রাচ্যীয় গবেষণা সংস্থার মুখপত্রে'র ১৯২৫ সালের ৯ নং ভল্যুম, ১ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা) ফরাসি ভাষায় তার গ্রন্থগুলো হলো–

১. আল ইসলাম।
২. তায়েফ।

জোসেফ শাখত (J. SCHACHT)

জার্মান চিন্তাবিদ। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষী। ইসলামি ফিকহ বা ইসলামি বিধানের ওপর তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। 'ইসলামি বিশ্বকোষ' ও 'সমাজবিদ্যা বিশ্বকোষে'র অন্যতম সম্পাদক। 'ইসলামি ফিকহের মূলনীতি' তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের যেসব বিধ্বংসী গ্রন্থ অনেকের কাছে শাস্ত্রীয়ভাবে স্বীকৃত

১. ইসলামি বিশ্বকোষ (THE ENCYCLOPEDIA OF ISLAM) আধুনিক কয়েকটি ভাষায় বইটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর পুনঃসংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নতুন সংস্করণের কয়েকটি খণ্ড এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
২. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ (SHORTER ENCYCLOPEDIA OF ISLAM)
৩. ধর্ম ও নৈতিকতা বিশ্বকোষ (ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS)
৪. (উপর্যুক্ত গ্রন্থের ইসলামিক বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাবলি দ্রষ্টব্য)
৫. সমাজবিদ্যা বিশ্বকোষ (ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL SCIENCES)
৬. (ইসলাম ও আরব সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দ্রষ্টব্য)
৭. ইতিহাস অধ্যয়ন।

(আর্নল্ড টয়নবি রচিত ইসলাম ও ইসলামের নবি সম্পর্কিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থাবলি

১. উইলিয়াম মুর রচিত 'মুহাম্মাদ-চরিত'।
২. আলফ্রেড গোয়ম রচিত 'ইসলাম'।
৩. ডি. এম ডোনাল্ডসন রচিত 'শিয়াদের ধর্ম'।
৪. বিশপ তুরপিন রচিত মহান চার্লসের ইতিকাহিনি।
৫. এইচ. লামেন্স কর্তৃক ফরাসি ভাষায় রচিত 'ইসলাম'।
৬. এস. যেমার কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত 'ইসলামের মতাদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ'।
৭. কে. গ্র্যাগ রচিত 'মিনারের আহ্বান'।
৮. এ. জে. আরবেরি কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত 'বর্তমান সময়ে ইসলাম'।
৯. এ. জে. আরবেরি কর্তৃক রচিত ইংরেজি ভাষায় 'কুরআনের অনুবাদ'।
১০. গোল্ডজিহের রচিত 'ইসলামি ভাষ্যের মতবাদগুলোর ইতিহাস'। যা মূলত রচিত হয় জার্মান ভাষায় এবং পরবর্তীতে আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।
১১. ফিলিপ হিট্টি রচিত 'আরবের ইতিহাস'। প্রকাশিত হয় ইংরেজি ও আরবি ভাষায়। বইটির একাধিক সংস্করণ বের হয়।
১২. আবরাহাম কাশ রচিত 'ইসলামে ইহুদিদের অবস্থান'। প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়।
১৩. ওয়েনসিঙ্ক রচিত 'ইসলামের মতাদর্শ'। ইংরেজি ভাষায় লিখিত।
১৪. লুই মাসিনোন রচিত 'ইসলামের স্বার্থে শহীদ সুফি হাল্লাজ'। ফরাসি ভাষায় লিখিত।
১৫. মাজিদ খাদ্দুরি রচিত 'ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তি'। প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়।

১৬. ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড রচিত 'ইলমে কালাম ও ফিকহের বিবর্তন এবং ইসলামে আইনি দৃষ্টিভঙ্গি'। প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়।

১৭. এ. আর. গিব রচিত 'ইসলামে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে অনূদিত হয় আরবি ভাষায়।

১৮. এ. আর. গিব ও প্রাচ্যবিদদের একদল গবেষক কর্তৃক রচিত 'ইসলামের পথ'। বইটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ও আরবি ভাষায় অনূদিত।

১৯. আর. এ. নিকলসন রচিত 'ইসলামে আধ্যাত্মচর্চা'। প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়। পরবর্তীতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

২০. আর্থার জেফরি রচিত 'কুরআনের ইতিহাসের উৎস'। ইংরেজি ভাষায় লিখিত।

২১. আর. বেল রচিত 'ইসলাম-স্বীকৃত খৃস্টবাদের পরিমণ্ডলে ইসলামের ভিত্তি'। ইংরেজি ভাষায় লিখিত।

২২. আর. বেল রচিত 'কুরআনের ভূমিকা'। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত।

২৩. ডি. এস. মারগোলিয়ুস রচিত 'ইসলামে প্রাথমিক উদ্বর্তন'। লিখিত হয় ইংরেজি ভাষায়।

২৪. প্রাগুক্ত লেখকের 'মুহাম্মাদ (সা.) ও ইসলামের সূচনা'। ইংরেজি ভাষায় লেখা।

২৫. প্রাগুক্ত লেখকের ইংরেজি ভাষায় রচিত 'আল ইসলাম'।

২৬. প্রাগুক্ত লেখকের ইংরেজি ভাষায় রচিত 'ইসলামি পাঠশালা'।

২৭. এরিক পিটম্যান কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত 'ব্রিজ টু ইসলাম'।

২৮. জি. ভন গ্রোনবাউম কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত 'মধ্যযুগীয় ইসলাম'।

২৯. প্রাগুক্ত লেখকের বিবিধ ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন 'আল ইসলাম'।

৩০. প্রাগুক্ত লেখকের ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'মুহাম্মাদি উৎসবসমূহ'।

৩১. প্রাগুক্ত লেখকের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'ইসলামি সংস্কৃতিতে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ'।

৩২. ঐ লেখকের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'ইসলামি সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চা'।

৩৩. ঐ লেখকের ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'আধুনিক ইসলামের ব্যাখ্যার প্রয়াসসমূহ'।

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুসৃত মাপকাঠি বা মানদণ্ড

প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের প্রায় সবাই ইসলাম নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এমন এক অদ্ভুত মানদণ্ডের আশ্রয় নেন, যা জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে নিতান্তই অর্বাচীন। একথা সর্বজনবিদিত যে, একজন নিষ্ঠাবান গবেষক তার গবেষ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত ঝোঁক থেকে মুক্ত থাকবেন এবং অনুসরণ করবেন টেক্সট ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডারের ওপর। তারপর পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের পর যে তথ্য বের হয়ে আসে একমাত্র সেটাই নির্ভরযোগ্য আবশ্যিক সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদই মনে মনে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা বা চিন্তা পূর্ব থেকেই পোষণ করে রাখেন এবং সেই ধারণা বা চিন্তাকে প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা দলিল বা প্রমাণ অনুসন্ধানে নেমে পড়েন। তাই তারা যখন তাদের প্রমাণ বা দলিলের অনুসন্ধান করেন তখন তারা নিজেদের মনে পোষণ-করা-মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রমাণগুলোর বিশুদ্ধতার চেয়ে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্টতাকে সমধিক গুরুত্ব দেন। (অর্থাৎ তারা স্বার্থান্ধ মানুষের মতো গবেষণার ক্ষেত্রে প্রমাণের সত্যতার চেয়ে নিজেদের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেন। হোক সে প্রমাণ অসত্য। তারা সেই অসত্য প্রমাণকে পুঁজি করে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।) আর অধিকাংশ সময় তারা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে আদর্শ মনে করে সাধারণ বা ব্যাপক কোনো ঘটনা কিংবা বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। তাই তারা তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধাঁধার বেড়াজালে পড়ে যান। তারা যদি

প্রবৃত্তি ও অসদুদ্দেশ্য দ্বারা চালিত না হতেন তাহলে তারা নিজেদের এহেন ধাঁধার বেড়াজাল থেকে বিমুক্ত রাখতে পারতেন। এখানে আমরা তাদের এরূপ গবেষণা পদ্ধতির কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

১. প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহেরের গবেষণাকর্মে আমরা দেখতে পাই তিনি ধারণাপোষণ করেন যে, সকল হাদিস হিজরি প্রথম তিন শতকের সৃষ্টি এবং এগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয় (মানুষের বানানো)। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি দাবি করে বসেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান ছিল না; এমনকি বড় বড় পণ্ডিত বা ইমামদেরও শরিয়তের বিধানাবলি ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের জ্ঞান ছিল না। তিনি তার এই ধারণার স্বপক্ষে কিছু দুর্বল ও অগ্রহণীয় রেওয়ায়েত বা বাণী-পরম্পরার অবতারণা করেন। যেমন তিনি দিময়ারি রচিত 'প্রাণীদের জীবনে'র (হায়াতুল হায়াওয়ান) বরাত দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. জানতেন না যে, বদরের যুদ্ধ আগে সংঘটিত হয়েছে না কি উহুদ যুদ্ধ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিহাস সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে সেও এরূপ বক্তব্যকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কেননা আবু হানিফা রহ. ইসলামের ঐসব ইমামদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ যারা ইসলামের যুদ্ধসংক্রান্ত বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যারা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞানের প্রসার-প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে তার দুই ছাত্র– ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর গ্রন্থসমূহে এর প্রচুর নজির রয়েছে।

সুতরাং একথা বলা নিতান্তই অবিবেচক হবে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে 'জীবনেতিহাসে'র (যুদ্ধ-ইতিহাস) ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধসংক্রান্ত বিধানাবলি রচনা করেছেন সেই 'জীবনেতিহাস' (যুদ্ধ-ইতিহাস) সম্পর্কে তিনি নিজেই অজ্ঞ ছিলেন। এখানে তার ফিকহের আলোকে এ বিষয়ের ওপর রচিত দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ করাকেই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। যে দু'টি গ্রন্থকে ইসলামি পররাষ্ট্রনীতির ওপর রচিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

এক. ইমাম আওজাঈ রহ. কর্তৃক রচিত রাসুলের জিবনেতিহাসের (সিয়ার বা যুদ্ধ-ইতিহাস) প্রত্যুত্তরে লেখা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. 'আর রদ্দু আলা সিয়ারিল আওযাঈ'।

দুই. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. রচিত 'আস্‌সিয়ারুল কাবির' বা 'বর্ধিত যুদ্ধ-ইতিহাস'। সারাখসি রহ. যে গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখেছেন। এ গ্রন্থটি পররাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত ইসলামি ফিকহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ। এটা সর্বশেষে 'ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান সংস্থা'র উদ্যোগে আরব লীগের তত্ত্বাবধানে পুনরায় প্রকাশ করা হয় পররাষ্ট্রনীতির কথা চিন্তা করে।

এই দুই গ্রন্থের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের জ্ঞানগম্যির সম্যক ধারণা পাই। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে পরিচালিত সকল ইসলামি অভিযান সম্পর্কিত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইতিহাস-জ্ঞানের ধারকবাহক তার এই ছাত্ররাই।

গোল্ডজিহের এই দুই গ্রন্থের ব্যাপারে মোটেই বেখবর ছিলেন না। তিনি যদি সত্যকে উপস্থাপন করার সদিচ্ছা রাখতেন তাহলে তার জন্য এটা জানা খুবই সহজ ছিল যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, নাকি সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তখন আর দিময়ারির 'হায়াতুল হায়াওয়ানে' উদ্ধৃত বর্ণনার দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তাছাড়া দিময়ারি কোনো ঐতিহাসিক নন। তার বইটি কোনো ফিকহ বা ইতিহাসের গ্রন্থও নয়। এখানে তিনি তার গ্রন্থের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় শ্রুতিরোচক কাহিনি ও বিরল তথ্যের সংকলন করে গেছেন কোনো প্রকার সত্যাসত্য যাচাই করা ছাড়াই।

তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তার সমকালীন মনীষাদের মাঝে নিজ নিজ মতাদর্শের পদ্ধতিগত বৈপরিত্য বা বৈরিতার কথা সবার জানা। যেটা তাদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীদের মাঝেও বহাল ছিল। এই বৈরিতাই ছিল ইতিহাস বর্ণনাকারী এবং কাহিনিকার ও বিচিত্র কাহিনির লেখকদের প্রধান উপজীব্য। এসবের মধ্যে বিচিত্র ঘটনা ও শ্রুতিরোচক কাহিনির বর্ণনা মুখ্য হওয়ার দরুন ইমাম আবু হানিফাকে মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো এগুলো অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। কখনোবা এসব নিছক জনশ্রুতির ওপর

ভিত্তি করে রচনা করা হয়। যেগুলোর অধিকাংশই তার অনুরাগী ও নিন্দুক উভয় পক্ষেরই বানানো মনগড়া কাহিনি মাত্র। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে এসবের জ্ঞানভিত্তিক কোনো মূল্য নেই।

যাই হোক, গোল্ডজিহের ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সম্বন্ধে রচিত যাবতীয় জ্ঞানগর্ভ ও প্রমাণিত ইতিহাসের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। তার পরিবর্তে তিনি মিথ্যা বর্ণনার ওপর নির্ভর করেন। যে ধরনের মিথ্যা বর্ণনাকে পুঁজি করে তিনি তার ধারণাকে (সমুদয় হাদিস তৃতীয় শতকের মুসলিমদের সৃষ্টি) সুসংহত করার চেষ্টা করেছেন, তা দেখে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও না হেসে পারবে না।

২. গোল্ডজিহেরের কর্মপদ্ধতির আরেকটি নমুনা– ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি রহ., এর সত্যনিষ্ঠা, পরহেজগারিতা, আমানতদারিতা ও ধর্মীয় বিধানাবলির ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাগণ এবং জারাহ ও তাদিল (হাদিস বর্ণনাকারীদের চরিতশাস্ত্র) এর বিশেষজ্ঞগণ সবাই একমত। অথচ গোল্ডজিহের এ বিষয়টাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ধারণাপোষণ করে বসলেন যে, ইমাম জুহরি রহ.-এর ব্যাপারে সবাই যেমনটা বলেছেন তিনি তেমনটা ছিলেন না। তিনি উমাইয়াদের পক্ষে হাদিস বানিয়ে প্রচার করতেন। তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের জন্য "বাহনকে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায় বাধা হবে না...।"– হাদিসটি বানিয়েছিলেন।

এব্যাপারে গোল্ডজিহের যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, এই হাদিসটি ইমাম জুহরি কর্তৃক বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সমসাময়িক। ...তার এসব ধারণাকে আমি বিস্তারিত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছি আমার গ্রন্থ 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা'র ৩৮৫ নং ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে।

৩. প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা অনারব মুসলিমদের চেয়ে বিজেতা আরবদের সমধিক উঁচু জাতি বা কুলীন হিসেবে প্রমাণের অপচেষ্টা করেছেন। তাদের প্রকৃত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাইতো প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ব্রোকেলম্যান তার 'মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেন–

"আরবরা যখন শাসক শ্রেণির ইতিহাস রচনা করেন তখন অনারবদের দেখা হয় নিছক দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। যারা ছিলেন 'রাইয়ত' অর্থাৎ 'কতি' (ভেড়ার পাল)। 'রাইয়তে'র বহুবচন হলো 'রাআয়া'। যেমনটা ভাবতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে একটি প্রাচীন ও উঁচু দরের উপমা। এমনকি সে উপমাটি এসিরীয়দের নিকটও সুপ্রিয় ও সুপাচ্য ছিল।"

এই প্রাচ্যতাত্ত্বিক মহাশয় ঐসব ঐতিহাসিক প্রমাণাদি থেকে বিলক্ষণ বিমুখ হয়ে গেছেন, যেসব প্রমাণাদি মুসলিম বিজেতাদের ন্যায়পরায়ণতা এবং আরব-অনারবনির্বিশেষে যেকোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি তাদের সদাচরণের কথা প্রমাণ করে। এখানে তিনি 'রাইয়ত' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আর এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, মুসলিমরা অনারবদের ভেড়ার পালের মতো বিবেচনা করত। আমরা যদি 'রাআ' শব্দটির ধাতুমূলের জন্য আরবি ভাষার অভিধানগুলোর শরণাপন্ন হই তাহলে দেখতে পাই 'আল-কামুসুল মুহিত' নামক অভিধানে বলা হয়েছে- রাই (আরবি রাআ ধাতুমূলের কর্তাবাচক শব্দ) বলা হয় কোনো সম্প্রদায়ের কর্মবিধায়ক বা নেতাকে। আর সম্প্রদায়কে বলা হয় 'রাইয়ত' এবং 'রাআইতুহু' অর্থ হলো 'আমি তার প্রতি সদাশয় হয়ে তার দেখভাল করলাম'। 'রাআইতু আমরাহু' মানে হলো 'হাফিজতুহু' (আমি তাকে হেফাজত করলাম)। 'রাআহু'র অর্থও অনুরূপ।

অতএব 'রাই' শব্দটি 'ভেড়ার রাখাল', সম্প্রদায়ের নেতা ও তাদের কর্মবিধায়ক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। আর 'রাইয়ত' শব্দটি 'চতুষ্পদ জন্তু বা ভেড়াজাতীয় জন্তু' ও 'সম্প্রদায়' অর্থে প্রয়োগ করা হয়। 'রিআয়াত' শব্দের সাধারণ অর্থ হয় 'হেফাজত করা' ও 'সদাচরণ করা'।

এই 'রিআয়াত' শব্দটি যখন ইসলামিক রিসোর্সগুলোতে ব্যবহৃত হয় তখন এটা বিশেষভাবে কেবল অনারবদের বেলাতেই 'ভেড়ার পাল' বোঝানোর জন্য এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। (যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারত যে, ইসলাম অনারবদের 'ভেড়ার পাল' মনে করে। অথচ আফসোস ব্রোকেলম্যান তাই ভেবেছেন) বরং আরব-অনারব সমুদয় সম্প্রদায়কে বোঝাতেই এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ইসলামিক রিসোর্সগুলোতে। এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারি রহ. প্রমুখ বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উল্লেখযোগ্য সহিহ হাদিস হলো—

'জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকে 'রাই' (দায়িত্বশীল, তত্ত্বাবধানকারী) আর তোমাদের প্রত্যেককেই 'রাইয়ত' (অধীনস্থ যাবতীয় বিষয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং যে নেতা তার জনগণের 'রায়ি' বা তত্ত্বাবধানকারী, তাকে তার 'রাইয়ত' বা জনগণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। আর যে পুরুষ বা গৃহকর্তা তার পরিবারবর্গের 'রায়ি' বা তত্ত্বাবধানকারী তাকে তার 'রাইয়ত' বা পরিজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে এবং যে গৃহকর্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানের 'রায়ি' বা তত্ত্বাবধানকারী তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। কোনো ব্যক্তির ভৃত্য তার মুনিবের সম্পদের 'রায়ি' বা তত্ত্বাবধানকারী তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। অতএব জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই 'রায়ি' বা তত্ত্বাবধানকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই 'রাইয়ত' বা অধীনস্থ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে।'

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন— 'রাই' হচ্ছে বিশ্বস্ত হেফাজতকারী, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্পিত বিষয়ের সুরক্ষার জিম্মাদার। তাই তাকে উক্ত বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে। (খণ্ড ১৩, অধ্যায় ৯৩)

ইমাম বুখারি রহ. প্রমুখ বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি হাদিসে এই 'রাইয়ত' শব্দটি মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে দেখা যায়— "যদি কোনো মুসলিম 'রাইয়ত' বা অধীনস্থ মুসলিম জনগণের নেতা মারা যাওয়ার সময় তিনি তার জনগণের জন্য আপদ বা গলগ্রহস্বরূপ (তাদের ওপর চেপে) থাকেন তখন আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেন।"

আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, এতো সব স্পষ্ট প্রমাণ থেকে ব্রোকেলম্যান কীভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আর কীভাবেই বা এমনটা দাবি করাকে বৈধজ্ঞান করলেন যে, মুসলিমরা অনারবদের 'ছাগলের পালের' মতো দেখতেন এবং রাইয়ত শব্দটি কেবল অনারবদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতেন। অথচ রাইয়ত শব্দটির ছাগলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টি ছাড়া তার সপক্ষে আর কোনো প্রমাণই নেই। ইতোপূর্বে এর আভিধানিক অর্থের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কথা আমরা জেনে এসেছি। তাই এই শব্দটিকে কেবল অনারবদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টির কোনো প্রমাণ তার কাছে নেই এবং এতে সন্দেহ বা অস্পষ্টতারও কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং তার এই বক্তব্য নিছক প্রবৃত্তি তাড়িত ও দুরভিসন্ধিমূলক।

৪. প্রাচ্যবিদ মায়ুরের উদ্ধৃতি দিয়ে মারগোলিয়ুস বলেন যে, মায়ুর মনে করেন- আরবের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা আরবি ভাষার অলংকারশাস্ত্র শিক্ষা ও ভাষার প্রয়োগ দক্ষতার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই এটা অসম্ভব নয় যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শাস্ত্রে চর্চার মধ্য দিয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

ভালো করে ভেবে দেখলে আমরা এখান থেকেই গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত মানদণ্ডসমূহের একটা চিত্র পেয়ে যাই। যেমন- এখানে গবেষণার বিষয়বস্তুটি দাঁড়িয়ে আছে গবেষক মায়ুরের অনুমানসর্বস্ব সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এমন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে যা আদৌ ঘটেনি। কারণ সেই যুগে না তো আরবরা অলংকার শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতেন, না তো তাদের জন্য কোনো বিদ্যালয় এবং শিক্ষক ছিল যারা তাদের জন্য এই শাস্ত্রের কায়দা-কানুন লিখে দেবে। আর না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের আগেই এই শাস্ত্রের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। (যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতো যে, তিনি নবুওয়াতের পূর্বে এই অলংকারশাস্ত্র শিখে নিয়ে কুরআন রচনায় তা প্রয়োগ করেছেন। অথচ এমনটা হয়নি) আর আমাদের সামনে এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একথাকে সত্য প্রমাণিত করতে পারে যে, তিনি নবুওয়াতের পূর্বেও ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। অন্যদিকে এটা নিশ্চিত যে, নবুওয়াতের পূর্বে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো গদ্য বা কবিতা রচনার ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না।

এর মধ্য দিয়ে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ মহোদয়গণের সমালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত মানদণ্ডসমূহের তৃতীয় মানদণ্ডটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তা হলো— বিভিন্ন রকমের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এবং উপকরণাদি ও অসংলগ্ন তথ্যসমূহ মাত্রাতিরিক্তভাবে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে উদ্ভাবন করা। যে উদ্ভাবনের পিছনে কল্পনা ও স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কোনো প্রমাণ বা কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা আরব ও প্রাচ্যের বিষয়বস্তুগুলোকে এবং প্রাচ্যের মানুষদের জীবনাচার ও অভ্যাসকে মুসলিম, আরব ও প্রাচ্য সম্পর্কীয় নিজস্ব (পূর্বতন) অদ্ভুত ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিচার করে থাকেন। কোনো কিছুকে বিচার করার এমনতর রীতি তাদের পদ্ধতিগত ত্রুটিকে আরও ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়। তারা যেন একথা স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নন যে, প্রতিটি পরিমণ্ডলের পৃথক পৃথক জীবনাচার, অভিরুচি ও পৃথক পৃথক বিচারবিধি বা মানদণ্ড রয়েছে।

ফরাসি মুসলিম প্রাচ্যবিদ নাসিরুদ্দিন দিনেত প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের বিবিধ বিষয়ে সমাধানের পদ্ধতি ও মানদণ্ড সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে তারা পরস্পরে একটি বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই মতানৈক্যের শিকার হতে বাধ্য হতেন। আর এসবের কারণ হলো তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস ও ইসলামের বিজয়েতিহাসকে তাদের ইউরোপীয় চিন্তাপদ্ধতির আলোকে বিচার করতে উদ্যত হয়েছেন। যার দরুন তারা সুদূর পরাহত ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা এর বিচার পদ্ধতি তেমনটা নয় যেমনটা তারা ভেবেছেন। তাছাড়া ইউরোপীয় চিন্তা পদ্ধতি বা দর্শন প্রাচ্যের নবিদের ইতিহাস সম্পর্কে নির্ভুল সমাধান দিতে সক্ষম নয়।

একটু এগিয়ে নাসিরুদ্দিন দিনেত বলেন– এসব প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের সমালোচনা করতে উদ্যত হন নিখাদ ইউরোপীয় ঢংয়ে। এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময় যাবত নিরন্তর তারা অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন তাদের অনুমানের ওপর ভর করে। একপর্যায়ে তারা বিনষ্ট করে ফেলেন গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলিম গবেষকদের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের সত্যগুলোকে।[৩৪] এজাতীয় ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ গবেষণার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোকে এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে বিকৃত ও বিনাশসাধন কি আদৌ সমীচীন ছিল? কিংবা এরূপ মনোবৃত্তির আদৌ কোনো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা বিন্দুমাত্রও নতুন কিছু প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। বরং ফরাসি, ব্রিটিশ, ডাচ প্রমুখ প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা যেসব নতুন নতুন মতামতগুলো

---

[৩৪] অবশ্যই তারা মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের উপর ভর করে একাজটি করেন। – অনুবাদক

দিয়েছেন সেগুলোকে যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে গোঁজামিল ও অনুমানসর্বস্বতা ছাড়া আর কিছুই পাই না। এছাড়াও আমরা আরও দেখতে পাই যে, হয়তো তারা নিজস্ব ধারণার বলে তাদের সমগোত্রীয় অন্য সমালোচকদের প্রমাণ করা মতামতকে নাকচ করে দিচ্ছেন আর না হয় নাকচ করা মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।

তারপর দিনেত এরূপ মতানৈক্যর কিছু উদাহরণ পেশ করেন এবং এই বলে শেষ করেন—

"নিজস্ব অনুমাননির্ভর এসব গবেষকদের মতবিরোধসমূহকে যদি আমরা এক এক করে বর্ণনা করা শুরু করি তাহলে আমরা অতিরঞ্জনের শিকার হবো এবং কোনো প্রকার সত্যকেই আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। তাই, আরবদের লেখা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। যেসব লেখক চেয়েছেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে তারা কঠোর সমালোচনাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আদলে লিপিবদ্ধ করবেন তারা কোনোপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টেই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। সমালোচনা, প্রতিপাদন ও উন্মোচনের যারপরনাই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা ওয়াল্টার স্কট ও আলেকজেন্ডার ডুমাসের মতো যেসব কাহিনিকারের প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করার কোনো চেষ্টাই ছিল না সেসব কাহিনিকারের পথ অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারেননি এবং কখনো পারবেনও না।

এই কাহিনিকার ও গল্পকারদের বেলায় আমরা দেখতে পাই তারা নিজ জাতির ঐসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কল্পনার রং মিশিয়েছেন যাদের তারা বোঝতে সক্ষম এবং এতে তারা তাদের ও নিজেদের মাঝে কালগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই আমলে নেননি। যাই হোক, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সর্বাগ্রে উচিত ছিল, যে নারকীয় বস্তুটি তাদের পশ্চিমী মনোভঙ্গি এবং প্রাচ্যের মনীষীদের মাঝে বিভেদের দেয়াল তৈরি করেছে তাকে ভেঙ্গে দেয়া। কেননা এবিষয়ে অসচেতনতা তাদের ভ্রান্তির শিকার হতে বাধ্য করবে।"[৩৫]

---

[৩৫]. আমির শাকিব আরসালানের 'বর্তমান ইসলামি বিশ্ব' এর ভূমিকার বরাত দিয়ে লামেন্স ইয়াসুঈর প্রত্যুত্তরে নাসিরুদ্দিন দিনেতের লেখা– 'ভিন্ন ভিন্ন উপত্যকার বাসিন্দা আমরা' থেকে সংগৃহীত।

ইউরোপে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মুখোমুখি

১৯৫৬ সালে আমি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনে যাই। এর পূর্বেই আমি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সম্পর্কে আমার বই 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা' নামক বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু তাদের সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা ও বিতর্কের পর তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা ও বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। সংস্কৃতি-সভ্যতার দিক থেকে এবং আইনশাস্ত্রের দিক থেকে আমাদের ইসলামি জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে তাদের ভয়াচ্ছন্নতার ব্যাপারে আমার ধারণাও আরও বদ্ধমূল হলো। মূলত এই ভয়াচ্ছন্নতার কারণেই ইসলাম, আরব ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থী মানসিকতায় তাদের মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সর্বপ্রথম আমি সাক্ষাৎ করি প্রফেসর এন্ডারসনের সাথে। যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত 'পার্সোনাল ল' উপবিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। এছাড়াও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিসরে ব্রিটিশ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যেমনটা আমাকে নিজের ব্যাপারে বলেছেন- কায়রোর আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে যে আরবি ভাষার কোর্স করাতেন সেই কোর্সের মাধ্যমে তিনি আরবি ভাষার শিক্ষা লাভ

করেন। এই কোর্সটা ছিল এক বছরের। অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় মিসরীয় সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশার দরুন আঞ্চলিক ভাষাও আয়ত্ব করে ফেলেন। আর ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন আহমদ আমিন, ড. তহা হুসাইন ও আহমদ ইবরাহীমের প্রদত্ত গণবক্তৃতার বদৌলতে। একসময় যুদ্ধের পর সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে লন্ডন ইউনিভার্সিটির মুসলিম পার্সোনাল ল উপবিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন।

এন্ডারসনের ইসলাম বিদ্বেষিতার একের পর এক উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। যদিও লন্ডনস্থ ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক ড. হামুদ গারাবাহ আমাকে ঐ সময় তার ইসলাম বিদ্বেষিতার অনেক কথাই বলেছেন। তবে এখানে আমি ঐ কথাটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি যা খোদ এন্ডারসন আমাকে বলেছিলেন। একবার এন্ডারসন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি আইনশাস্ত্রের ওপর ডক্টরেট করতে আসা আজহারের গ্রাজুয়েট এক ছাত্রকে বহিষ্কার করে দেন খুবই সামান্য একটি কারণে। কারণটি ছিল, ঐ ছাত্রটি ইসলামে নারী অধিকার বিষয়ে তার থিসিস উপস্থাপন করে এবং এবিষয়টি দলিলসহ প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীকে তার পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে। একথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে আপনি এই ছাত্রকে বহিষ্কার করলেন? এবং কীভাবেই বা তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা থেকে বাধা প্রদান করলেন? অথচ আপনারা তো দাবি করেন যে, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনারা চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। উত্তরে এন্ডারসন বললেন, এই ছাত্রটি বলে ইসলাম নারীকে অমুক অধিকার দিয়েছে, তমুক অধিকার দিয়েছে। সে কে ইসলামের নাম ভেঙ্গে খাওয়ার? সে কি ইসলামের সর্বজনস্বীকৃত গবেষক? সে কি ইমাম আবু হানিফা, নাকি ইমাম শাফেঈ যে এভাবে কথা বলবে এবং ইসলামের হয়ে কথা বলবে? তার নারী অধিকার সম্পর্কিত মতামতগুলোর পক্ষে পূর্বজ ইসলামি আইনবিদদের কোনো বক্তব্য নেই। আসলে সে আত্মম্ভরী। কারণ সে দাবি করে আবু হানিফা ও শাফেঈর চেয়ে ইসলামকে সে বেশি অনুধাবন করতে পেরেছে।

এটা হচ্ছে হুবহু প্রাচ্যতাত্ত্বিক এন্ডারসনের মুখের কথা। যিনি এখনও বেঁচেবর্তে আছেন। তবে তিনি এখনও লন্ডন ইউনিভার্সিটির ওই পদে বহাল আছেন নাকি অবসরে আছেন সঠিক জানা নেই।

স্কটল্যান্ডের এডিনবরা ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনের একবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেখানে ইসলামি গবেষণা বিভাগের প্রধানের পদে যে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ছিলেন, তিনি পুরোদস্তুর শুভ্র পোশাকধারী এক পাদ্রী ছিলেন। তার বাড়ির সামনে নিজ নামের সাথে তার ধর্মীয় উপাধিটিও লেখা ছিল।

স্কটল্যান্ডের আরেক বিদ্যাপীঠ গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির আরবি গবেষণা বিভাগের প্রধানও ছিলেন একজন পাদ্রী। যিনি জেরুজালেমে প্রায় বিশ বছর খৃস্টান মিশনারির কাজ করেন। যার দরুন তিনি আরবি ভাষাভাষী লোকদের মতো আরবি ভাষা বলতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। যেমনটা তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন আমার গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনের সময়। অবশ্য যদিও ইতোপূর্বে আমাদের ১৯৫৪ সালে লেবাননের বাহামদুন শহরে অনুষ্ঠিত মুসলমান-খৃস্টান কনফারেন্সে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অন্যদিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনকালে দেখতে পেলাম সেখানে আরবি ও ইসলামি গবেষণা বিভাগের প্রধান হয়ে বসে আছেন একজন ইহুদি। যার নিজেরই আরবি ভাষায় কথা বলতে অনেক বেগ পেতে হয় এবং খুবই গদাইলস্করিচালে কথা বলেন। এছাড়াও তিনি একসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে লিবিয়ায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন। তখনই তিনি আঞ্চলিক আরবি শেখার সুযোগ পান। এরপর তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ঐ বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে নিজ দেশ ব্রিটেনে ফিরে আসেন। প্রাচ্যতত্ত্বের ছাত্রদের উদ্দেশে তার পাঠদানের পদ্ধতি দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। পাঠ্যসূচিতে ছিল যামাখশারির লেখা 'আল-কাশশাফ' থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা (অথচ এই ইহুদি প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রচলিত আরবি দৈনিকের সহজ একটি বাক্যেরও ভালোভাবে মর্মোদ্ধার করতে পারেন না।) এছাড়াও পাঠ্যতালিকায় ছিল বুখারি ও মুসলিমের হাদিস এবং হানাফি ও হাম্বলি মাজহাবের প্রধান গ্রন্থ থেকে ইসলামি ফিকহ বা আইনের বিভিন্ন অধ্যায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই বিষয়গুলো আপনার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কোন উৎসগ্রন্থ থেকে? তিনি বললেন, এগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি

গোল্ডজিহের, শাখত, মারগোলিয়ুসের মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গ্রন্থ থেকে। এই তিন প্রাচ্যতাত্ত্বিকের নামোল্লেখই যথেষ্ট একথা বোঝানোর জন্য যে, আলোচ্য এই দুরভিসন্ধিমূলক পাঠ্যক্রম-সংকলনটি কতটুকু ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি নির্বিচার বিরোধিতার পথকে সুগম করে দেয়।

তবে হ্যাঁ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির আরবি ও ইসলামি গবেষণা বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতাত্ত্বিক আরবেরি। যার আরবি ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তার সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাকে বলেন- আমরা প্রাচ্যবিদরা আমাদের ইসলাম নিয়ে গবেষণাগুলোতে অনেক ভুল করে বসি। আমাদের উচিত হলো গবেষণার এই ক্ষেত্রটিতে মনোনিবেশ না করা। কেননা এসব গবেষণায় মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে আপনারা আরব মুসলিমরা আমাদের চেয়ে অধিক যোগ্য ও পারঙ্গম। তবে হয়তো একথা নিছক প্রশংসা হিসেবে বলেছেন। না হয় তিনি একথা বলেছেন এর সত্যতার ওপর বিশ্বাস করেই।

আরেকজন প্রাচ্যতাত্ত্বিক রবসন। তার সাথে আমার দেখা হয় ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার সিটিতে। তার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন তার সামনে ছিল আবু দাউদের একটি হস্তলিখিত সংস্করণ। হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাসের ওপর তার কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেসব গ্রন্থে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট বা একদেশদর্শী প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের দেখানো পথেই হেঁটেছেন। তার সাথে আমি পূর্বেকার পক্ষপাতমূলক প্রাচ্যতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো এবং অসঙ্গতিপূর্ণ গবেষণাগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হলাম। তার সামনে আমি গোল্ডজিহেরের মতামতগুলোকে তুলে ধরে তার ঐতিহাসিক ভ্রান্তিগুলো এবং তথ্যগত অসঙ্গতিগুলোকে প্রমাণ করলাম। তখন তিনি আমাকে এই বলে জবাব দিয়েছিলেন— আধুনিক যুগে প্রকাশিত, সহজপ্রাপ্য ও প্রসিদ্ধ ইসলামি গবেষণা বা রচনাবলি গোল্ডজিহেরের সময়ে অজানা বা অনাবিষ্কৃত ছিল। এইদিক বিবেচনা করে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধুনিক যুগের প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা ইসলামি রিসোর্সগুলোর সম্বন্ধে গোল্ডজিহেরের চেয়ে বেশি অবগত। আমি তাকে বললাম- এযুগে গোল্ডজিহের ও মারগোলিয়ুসের মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের তুলনায় আপনাদের গবেষণাগুলো অধিক সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার আশাপোষণ করি। তিনি বললেন- আমিও এমন আশাপোষণ করি।

হল্যান্ডের লেইডেন ইউনিভার্সিটিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল জার্মান ইয়াহুদি প্রাচ্যতাত্ত্বিক শাখত-এর সাথে। যিনি আমাদের বর্তমান সময়ে ইসলামের বাস্তবতাসিদ্ধ তথ্যসমূহের বিকৃতিসাধন এবং ইসলামের বিপক্ষে অপপ্রচার ও দুরভিসন্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে গোল্ডজিহেরের একনিষ্ঠ প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমি গোল্ডজিহেরের ভুলগুলো এবং তার আমাদের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের হীন-অভিপ্রায় সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ তার সাথে বিতর্ক করি। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি এসবকে অস্বীকার করেন। তখন আমি তার সামনে কেবল হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে তার লিখিত বক্তব্যকে উদাহরণত উপস্থাপন করি। শাখতের কাছে বিষয়টি অদ্ভুত মনে হলে তিনি গোল্ডজিহেরের গ্রন্থের শরণাপন্ন হন। ওই সময় আমরা তার ব্যক্তিগত পাঠাগারেই অবস্থান করছিলাম। ফিরে এসে আমাকে তিনি বললেন- আপনার বক্তব্যে সত্যতা রয়েছে। গোল্ডজিহের এখানে ভুল করেছেন। আমি তাকে বললাম– এটা কি নিছক ভুলই? তিনি আমাকে তখন চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন– আপনি কেন তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণাপোষণ করছেন? তারপর আমি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম জুহরির অবস্থান নিয়ে গোল্ডজিহেরের অপব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। যেসব ঐতিহাসিক সত্য ইমাম জুহরি সম্পর্কে তাঁর মতামতকে নাকচ করে দেয় সেসব তথ্য তার সামনে উপস্থাপন করলাম।

পরিশেষে বিতর্কের এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করলেন এবং বললেন— গোল্ডজিহেরের এটাও আরেকটি ভুল। গবেষকদের কি ভুল হয় না? আমি তাকে বললাম—গোল্ডজিহের প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক এমন এক বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা যেটার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইসলামি বিধি-বিধান সম্পর্কে বাস্তব ও ইতিহাসসম্মত গবেষণা উপস্থাপন করার জন্য। তাহলে কেন তিনি ইমাম জুহরি রহ. সম্পর্কে আলোচনা করার সময় নিজস্ব এই আদর্শকে বেমালুম ভুলে গেলেন? কীভাবে তিনি ইমাম জুহরির ওপর অপবাদ আরোপ করলেন যে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের মর্যাদার হাদিসটি বানিয়ে উপস্থাপন করেছেন? অথচ জুহরি রহ.-এর সাথে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ইবনে যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুর মৃত্যুর কয়েক বছর পর। একথা শুনে শাখতের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং হাত কচলাতে শুরু করলেন। আর তার চেহারায় ক্রোধ ও অস্বস্তির ছাপ প্রকট হয়ে উঠলো। তার সাথে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানলাম এই

বলে– আপনি যেটাকে 'ভুল' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, এজাতীয় 'ভুল' গত শতাব্দীতে খুব প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এগুলোকে সত্য ও বাস্তবসম্মত মনে করে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা একে অপরের বরাত দিয়ে বর্ণনা করতে থাকেন। আর এসব বই আমাদের হস্তগত হয় কেবল লেখকদের মৃত্যুর পরই। তাই আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে, আপনারা আপনাদের কৃত 'ভুল-ভ্রান্তিগুলো'র ব্যাপারে আমাদের পর্যালোচনাকে আমলে নিবেন। যাতে আপনাদের জীবদ্দশাতেই সেসব ভুল-ভ্রান্তিকে শাস্ত্রীয় সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বে সেগুলোকে শুধরে নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, এ প্রাচ্যবিদ মহাশয় কায়রো ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামি আইন-কানুনের ইতিহাসের ওপর তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। যা তার গুরু গোল্ডজিহেরের আদলে রচিত। ইসলাম সম্পর্কে কুৎসা ও তথ্য বিকৃতিতে এই বই পরিপূর্ণ।

সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রাচ্যতাত্ত্বিক নেবার্গ-এর সাথে। যতটুকু আমার ধারণা তিনি ইবনে খাইয়াতের 'কিতাবুল ইনতিসারে'র সম্পাদনার কাজটি তত্ত্বাবধান করেছিলেন। (কায়রোর 'সংকলন ও অনুবাদ সংস্থা' যে গ্রন্থটি আগে একবার প্রকাশ করেছিলেন।) তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ আলাপচারিতা হয়। যার অধিকাংশ ছিল ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা ও বইয়ের ব্যাপারে। আমি গোল্ডজিহেরকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এলাম। তাঁর বিভ্রান্তিকর তথ্য ও সত্য-বিকৃতির কিছু নজির নেবার্গের সামনে তুলে ধরলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন– আসলে গোল্ডজিহের বিগত শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা তাঁর অনেক বরাত দিয়েছেন। তবে বর্তমান সময়ে আপনাদের দেশে (আরব ভূখণ্ডগুলোতে) প্রকাশিত ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রসারের বদৌলতে এখন কেউ আর বিগত শতাব্দীর মতো গোল্ডজিহেরের বরাত দেন না। আমরা মনে করি গোল্ডজিহেরের সময় এখন আর নেই।

এই ভ্রমণে উপর্যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়াও আরও অনেক দেশের রাজধানীস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের আমার সুযোগ হয়। যেমন– বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, জার্মান, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই সময়ে চাকরিরত সব প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

যেসব স্থানের কথা আমি এইমাত্র বললাম এবং এই ভ্রমণের সময় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সাথে আমার সাক্ষাতের যে স্মৃতিকথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, তার আলোকে কতিপয় সত্য আমার কাছে ফুটে ওঠে।

প্রথমত, গরিষ্ঠসংখ্যক প্রাচ্যতাত্ত্বিকই ধর্মযাজক। আর না হয় সাম্রাজ্যবাদী কিংবা ইয়াহুদি। তবে কিছু লোক এর ব্যতিক্রমও আছেন।

দ্বিতীয়ত. অ-উপনিবেশবাদী পশ্চিমা দেশগুলোর (যেমন, স্ক্যান্ডিনেভীয় ভূখণ্ডগুলো) তুলনায় উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে প্রাচ্যতত্ত্বের কাটতি বা জয়জয়কার বেশি।

তৃতীয়ত. অ-উপনিবেশবাদী পশ্চিমের দেশগুলোর আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা গোল্ডজিহের এবং তার মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের চরমভাবাপন্ন বা কট্টরপন্থী মনে করেন।

চতুর্থত. প্রধানত প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্ভব হয় খৃস্টানদের গির্জা থেকে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে কখনো এর উদ্ভব হয়েছে গির্জার হাত ধরে, কখনো পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ের হাত ধরে। এই উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠান থেকেই এর শক্তি সঞ্চয় হয়েছে।

পঞ্চমত. ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বরাবরই প্রাচ্যতত্ত্বকে ইসলামের অবলুপ্তকরণ ও মুসলিমদের নিন্দাচর্চার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর এটাই হচ্ছে প্রাচ্যতত্ত্বের চিরাচরিত রূপ।

তাই ফ্রান্সে আমরা দেখতে পাই, বর্তমানকালের ফরাসি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দুই গুরু ব্ল্যাশার ও মাসিনোনকে আরব ও মুসলিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবা করে যেতে।

অন্যদিকে ব্রিটেনে দেখা যায়, (যা ইতিপূর্বেও বলেছি) লন্ডন ইউনিভার্সিটি, এডিনবরা, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, গ্লাসগো ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যতত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা দিতে। এর তত্ত্বাবধানে থাকেন ইয়াহুদি এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও মিশনারিরা। যারা পশ্চিমের ছাত্রদের জন্য প্রথমে গোল্ডজিহের ও মারগোলিয়ুসের রচনাবলিকে মৌলিক রেফারেন্স গ্রন্থ এবং তারপর শাখতের রচনাবলিকে মৌলিক রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে বরাবরই উস্তাদ। আর আরব এবং মুসলিমদের কেউ যখন তাদের কাছে ডক্টরেট ডিগ্রির শরণাপন্ন হন তখন তাঁরা এমন কোনো ডক্টরেট অভিসন্দর্ভকে কখনোই অনুমোদন দেন না, যেটার প্রতিপাদ্য থাকে ইসলামের প্রতি সুবিচার এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করা।

ড. আমিন মিসরি সাহেবের (যিনি আজহার ইউনিভার্সিটিতে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে এবং কায়রো ইউনিভার্সিটিতে চারুকলা অনুষদ ও শিক্ষাবিজ্ঞান অনুষদে পড়াশোনা করেছেন) ব্রিটিনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দর্শনের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়ে নিছক অভিসন্ধর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তার বর্ণনা তিনি আমাদের দিয়েছেন। আমরা এখানে তা তুলে ধরলাম–

বছর কয়েক হয়ে গেল ড. আমিন মিসরি ব্রিটিনে এসেছেন দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা এবং সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার জন্য। অথচ তিনি সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানতেন না। বিশেষ করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তিনি তাদের গ্রন্থাবলিতে ইসলাম সম্পর্কে কুৎসা ও তথ্যবিকৃতির হিড়িক দেখে হতবাক হতে বাধ্য হলেন। বিশেষত শাখতের রচনা পড়ে। তারপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাঁর পিইচডি থিসিস বা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু হবে ইসলামের আইন-কানুনের ইতিহাস সংক্রান্ত শাখতের গ্রন্থটির সমালোচনা।

তারপর তিনি প্রফেসর এন্ডারসনের কাছে গিয়ে তাঁর এই থিসিসের পরামর্শক বা সুপারভাইজার হয়ে এর সংক্ষেপায়ণ এবং এর প্রতিপাদ্য-বিষয়কে অনুমোদন দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তার বিষয়ের ব্যাপারে এই প্রাচ্যতাত্ত্বিক মহাশয় দ্বিমত করে বসলেন। তাই তার কাছ থেকে এর অনুমোদন পাওয়ার আশা নিতান্তই হাস্যকর। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পূর্ণ আশাহত হওয়ার পর তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। সেখানকার ইসলামি গবেষণার যারা তদারকি করেন তাদের দ্বারস্থ হলেন এই আশা নিয়ে যে, তার থিসিসের বিষয়টিকেই যেন চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু তাদের সম্মতির কোনো লক্ষণই দেখা গেলে না। তথাপিও তিনি মনোবল না হারিয়ে আশায় বুক বাঁধলেন হয়তো তাঁরা একপর্যায়ে সম্মত হবেন। কিন্তু তাঁরা তাকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন– "তুমি যদি তোমার ডক্টরেট ডিগ্রিটি হাসিল করতে চাও তাহলে তোমাকে শাখতের সমালোচনা থেকে সরে আসতে হবে। কেননা আমাদের ইউনিভার্সিটি কাউকে এজাতীয় অনুগ্রহ করতে প্রস্তুত নয়।" তখন তাকে বাধ্য হয়ে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে হলো। বিষয় স্থির করলেন "হাদিস বিশেষজ্ঞদের নিকট হাদিস-পর্যালোচনার মানদণ্ড"। তারপর তাঁরা তাকে অনুমোদন করলেন এবং তিনি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গেলেন। আর তিনি এখন দামেশ্ক ইউনিভার্সিটির ইসলামি শরিয়ত অনুষদের অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

এ হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। যা ছিল বিশেষত গোল্ডজিহেরের গ্রন্থাদি ও তার মতাদর্শ সম্পর্কে। তবে আমি আমার 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা' নামক

গ্রন্থে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের অধীনে বিশদ আলোচনা করেছি এই ইয়াহুদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকের একদেশদর্শিতা, সত্য ও তথ্য বিকৃতির ব্যাপারে এবং তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অপব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে। আরও আলোচনা করেছি বিদ্বজ্জনের নিকট অগ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্রের ওপর তাঁর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে এবং আমাদের সত্যসন্ধ বিশেষজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত রেফারেন্স গ্রন্থসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সম্পর্কে।

আর আমেরিকার কথা তো বলাই বাহুল্য। প্রাচ্যতত্ত্ব তো এখানে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি চূড়ান্ত বিরুদ্ধাচরণের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামি গবেষণা বা ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের প্রধান তিনিই হোন যিনি ইসলামের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি হিংসা ও শত্রুতাপোষণ করেন। যেমনটা ইতিপূর্বে আমাদের উল্লিখিত সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী প্রাচ্যবিদ ও তাদের গ্রন্থাদির তালিকা থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

দুঃখজনক বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বের যেসব ছাত্ররা নিজ নিজ দেশে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে তাঁরা বরাবরই মুখিয়ে থাকে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার জন্য। যার কারণে ইসলামি স্টাডিজের ছাত্রদের সামনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য ওইসব বিতর্কিত রেফারেন্স গ্রন্থই হয় তাদের একমাত্র ভরসা। আর এই ছাত্ররা যেহেতু আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ তাই তাদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে কুৎসা ও অপপ্রচারগুলোকেই মনে হয় স্বয়ং মুসলিম আইনজ্ঞ (তথা ফকিহ বা বিধানবিদ) ও বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ থেকেই সংকলন করা।[৩৬]

তাই আমাদের আরবি মাধ্যমের ইউনিভার্সিটিগুলো ইংরেজি ভাষায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনে আগ্রহীদের জন্য আলাদা বিভাগ খোলার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম বিশ্বের ছাত্রদের দৃষ্টিকে পশ্চিমের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে সরিয়ে আরবদেশের দিকে নিবদ্ধ করা তাদের দায়িত্ব। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী, চরমপন্থী প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে তাদের বাঁচানো যাবে।

---

[৩৬] অনারব– বিশেষত উপমহাদেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরের বেলায়ও একই সত্য প্রযোজ্য। বরং এখানকার অবস্থা আরো ভয়াবহ। কারণ আরবিভাষীরা আরবি রেফারেন্স গ্রন্থগুলো ইচ্ছা করলেই খুব সহজে পড়তে পারেন। অনারবরা এটা পারেন না বিধায় পশ্চিম থেকে আহরিত 'ইসলাম-শিক্ষা'ই তাদের কাছে প্রকৃত ইসলাম হতে বাধ্য।

পরিশিষ্ট : প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে আমার শেষ নিবেদন

ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান হয় পশ্চিমাদের রাজনীতিক ও সামরিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর নতুন নতুন পন্থায় প্রতিশোধ নেয়ার ষড়যন্ত্র থেকে নিরস্ত হননি। তাদের প্রথম পন্থাটি ছিল ইসলাম নিয়ে গবেষণা ও সমালোচনা করা।

সম্পূর্ণ মধ্যযুগব্যাপী পশ্চিমে খৃস্টীয় আদর্শের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো এই প্রাচ্যতত্ত্ব। এর পালে নতুন হাওয়া সঞ্চার করে মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ কায়েম করার সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের জাগরণ। মুসলিম বিশ্বের সেসময়টা ছিল সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, সামরিক ও অর্থনীতিক অবক্ষয়ের সূচনার সময়। এই সুযোগেই পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের একের পর এক শহর ক্রমান্বয়ে কুক্ষিগত করতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ ভূখণ্ডে পশ্চিমাদের আধিপত্য বিস্তারের কাজটি সম্পূর্ণ সমাধা হওয়ার পূর্বেই তাদের ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে লাগল। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই— মুসলিম সম্প্রদায় ও সমাজগুলোর সামনে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সাফাই গাওয়া বা এর নিষ্কলুষতা প্রমাণ করা। আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য যে, বিগত শতাব্দীতেই তারা তাঁদের ইসলামি-

জ্ঞান-সম্পদসংক্রান্ত যাবতীয় ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু এই গবেষণাটি প্রকৃতিগতভাবেই সত্যকে তুলে আনতে অপারগ হয়েছে দুটি প্রতিবন্ধকের কারণে—

প্রথমত. ধর্মীয় গোঁড়ামি। যা সবসময়ই ইউরোপের রাজনীতিবিদ ও সামরিক নেতাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। **যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জোট সেনা কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকৃত হওয়ার পর লর্ড এ্যালেনবে যখন তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেন— "এখন বলা যায় যে, ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে"। অর্থাৎ সামরিক দিক থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান হয়েছে এই বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকৃত করার মধ্য দিয়ে।**

উল্লেখ্য, পশ্চিমাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি বরাবরই অপরিবর্তিত ছিল। যার প্রমাণ তাঁদের ইসলাম ও ইসলামের সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখা বহু গ্রন্থের মাঝেই পাওয়া যায়। আর যেসব গবেষক ও সাহিত্যিকদের মাঝে ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সুবিচারের প্রবণতা পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মীয় প্রভাব বলয়ের বাইরে। এক্ষেত্রে আমরা গোস্তাভ ল্যাবনের 'আরব সভ্যতার ইতিবৃত্ত'র উদাহরণ টানবো। কেননা ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার প্রতি সুবিচার করে লেখা পশ্চিমাদের গ্রন্থরাজির মাঝে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ এটি। আর গোস্তাভ ল্যবনকে ধর্মীয় প্রভাববলয় থেকে মুক্ত বলছি এই জন্য যে, তিনি হলেন একজন বস্তুবাদী দার্শনিক, যে কিনা মোটেই কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তার এই অবিশ্বাস এবং ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি সুবিচারের দরুণই পশ্চিমাদের বিদ্বৎসমাজে তার জ্ঞানগরিমার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা হয় না।

বলা দরকার, কেবল এজন্যই তিনি উনিশ শতকের অন্যতম অবিসংবাদিত মহান সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমারা তার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ বা অবিচার করেছেন। বিশেষত ফরাসিরা।

দ্বিতীয়ত. আরো ও উনিশ শতকে পশ্চিমাদের অর্জিত অবকাঠামোগত ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির ফলে তাদের গবেষক, ইতিহাসবিদ ও লেখকদের মনে অতিশয় আত্মম্ভরিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি একপর্যায়ে তারা

বিশ্বাস করতে শুরু করেন মিসরীয় সভ্যতা বাদে সকল ঐতিহাসিক সভ্যতাসমূহের মূল তারাই।

আর পশ্চিমের চিন্তাপদ্ধতির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ এই চিন্তাপদ্ধতি নিছকই তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ (যুক্তিকেন্দ্রিক)। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায়ের চিন্তাকৌশল– বিশেষত ইসলামি চিন্তাপদ্ধতি ব্যাপক ও ঋজু। আরও নির্ভুলভাবে ব্যক্ত করতে হলে বলতে হয় এই চিন্তাপদ্ধতি 'আনুপুঙ্খিক'। যেমনটা প্রাচ্যবিদ গিব বলেছেন তার 'ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি' নামক বইয়ে। আর এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামি চিন্তাপদ্ধতি যেকোনো বিষয়বস্তুকে বিচার করে তার যাবতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে পর্যালোচনা করার মাধ্যমে। ইসলামি চিন্তাপদ্ধতি সামষ্টিকভাবে পর্যালোচনা করে বিষয়বস্তুর অন্তর্গত যাবতীয় অংশ (ব্যাষ্টি) সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাষ্টিকে পর্যালোচনা করে সমষ্টির কাছে পৌঁছে।

পশ্চিমারা কেবল তাদের চিন্তাপদ্ধতি প্রয়োগ করেন অধিকৃত বা ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়সমূহের যে দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়সমূহের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও তাদের স্বাভাবিক জীবানাচারে যে পশ্চাদপদতা রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।

উনিশ শতকের শুরুতে যখন পশ্চিমা সভ্যতার সাথে আমাদের যোগসূত্র কায়েম হলো এবং যখন আমাদের মাঝে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটতে লাগল তখন আমাদের বিদ্বৎসমাজের (শরিয়াহ বিশেষজ্ঞরা ছাড়া) সামনে পূর্বাচার্যদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনার পথ সুগম ছিল না। কারণ প্রাচীন এগ্রন্থগুলো যথার্থ সুবিন্যস্ত নয় এবং পশ্চিমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির আদলেও বিন্যস্ত নয়। তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই শরণাপন্ন হন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গ্রন্থাবলির। আর প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা হলেন এমন সম্প্রদায়, যারা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হয়ে তাদের সাধারণ গ্রন্থাগারেই ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির রেফান্সগ্রন্থের অনুসন্ধানে নিজেদের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাদের একজন তো ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্র একটি দিক নিয়ে বই

লিখতে সময় নিয়েছেন পূর্ণ বিশ বছর। তিনি আমাদের পূর্বজ বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাদির হাতের কাছে যে রেফারেন্সই পেয়েছেন উদারহস্তে গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমের বিশেষজ্ঞদের এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মপন্থা ও এর জন্য পূর্ণাঙ্গ মনোনিবেশ এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ধর্মীয় অভীপ্সার বদৌলতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দিতে। আর সেটা তারা এমনভাবে করলেন যে, যা দেখে আমাদের 'শিক্ষিতসমাজে'র চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। উপরন্তু আমাদের 'শিক্ষিতসমাজে'র ওপর সেটা যথেষ্ট প্রভাবও বিস্তার করেছিল। যা তাদের মেধাকে অধিগত করে নিয়েছিল। বিশেষ করে যখন তারা পশ্চিমাদের গ্রন্থনাকৌশল ও আমাদের শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থরাজির গ্রন্থনাকৌশলের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলো তখন তারা পশ্চিমাদের জ্ঞান ও জ্ঞানের পরিধি দেখে বিমোহিত হয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আর ধারণা করতে লাগলেন যে, তারা সত্য বৈ কিছু লিখতেই পারেন না এবং বিশ্বাস পোষণ করলেন যে, তাদের যেসব অভিমত আমাদের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীত সেসব অভিমতের ক্ষেত্রে তারাই অধিকতর সঠিক ও সত্যনিষ্ঠ। কারণ এরা মনে করে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা গবেষণার ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞানতাত্ত্বিক পন্থা অনুসরণ করে চলেন, তা থেকে তাঁরা কখনো বিচ্যুত হননি। এভাবেই প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গবেষণা ও মতামতের প্রতি (এক প্রকার) নির্ভরতা ও আস্থার জন্ম হয়।

খোদ প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ ও অপরাপর পশ্চিমী গবেষকরা যেসব ইসলামি রেফারেন্সগ্রন্থ দ্বারা ঋদ্ধ হয়েছেন সেসবের দ্বারস্থ হতে তথাকথিত এই বিদ্বৎসমাজ মোটেই প্রস্তুত নন। এক্ষেত্রে কয়েকটি কার্যকারণ থাকতে পারে।

১. ইসলামি উৎস গ্রন্থের পাঠোদ্ধার তাদের জন্য সহজসাধ্য না হওয়া।

২. শাস্ত্রীয় বিষয়ে ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের দ্রুততা।

৩. আমাদের শিক্ষিত সমাজ, ইসলামি গবেষক সম্প্রদায় ও অন্যান্য পরিমণ্ডলে প্রচলিতও প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে মতামত উপস্থাপনের হীন মানসিকতা।

একটি সময় ছিল যখন আমাদের ওপর নিজেদের অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা ও অনাস্থামূলক মনোবৃত্তি চেপে বসেছিল। অপরদিকে পশ্চিমের গবেষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও নেহাতই সুধারণা জেঁকে বসেছিল আমাদের মনে। এমনকি একপর্যায়ে যখন রাজনীতিক সচেতনতামূলক আন্দোলন শুরু হলো এবং পশ্চিমাদের কব্জা থেকে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূত্রপাত হলো তখন আমাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার প্রয়োজনবোধ ও আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হলো। পাশাপাশি আমাদের সভ্যতা ও উত্তরাধিকারের (জ্ঞান-সম্পদ) প্রকৃত মূল্যবোধ জাগ্রত হয় এবং আমাদের নিজস্ব আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান ও জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ওপর নির্ভরতার পূর্ববর্তী মতাদর্শের জন্য অনুশোচনাবোধ তৈরি হয়। আর তখন এই সচেতনতা বা জাগরণটি ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের ধর্মীয় ও অপরাপর বিদ্বৎসমাজের মাঝে। তারপর থেকে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকে প্রকৃত বাস্তবতা। প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের গবেষণা এবং তাদের ধর্মীয় ও সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পেছনে থাকা প্রকৃত বাস্তবতা।

তারপর থেকে আমাদের পথচলা কখনো থেমে থাকেনি এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যে দৃষ্টিভঙ্গির শক্তি অশেষ ও স্বকীয়তা অফুরন্ত। কেননা এটাই হচ্ছে বস্তু জগতে আল্লাহর বিধান।

করুণাময়ের কৃপায় অচিরেই আমরা এমন এক সময়ে উপনীত হতে যাচ্ছি যখন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা এই ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে যে, কীভাবে আমরা আত্মভোলা ও কী করে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের কূটচালে বেমালুম ধোঁকাগ্রস্ত ছিলাম।

সুনিকট ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে যখন আমরা পশ্চিমাদের জ্ঞান-সম্পদ নিয়ে গবেষণা এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনায় মনোনিবেশ করব। আর এমন সময়ও আসবে যখন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা পশ্চিমাদের আবিষ্কার করা সমালোচনার মানদণ্ড প্রয়োগ করে খোদ তাদেরই ধর্মবিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমালোচনা করবে। তাদের ধর্মবিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন আমাদের ধর্মদর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের

ওপর বর্তমানে তাদের আরোপ করা দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার চেয়ে আরও দুর্বলতর ও ভঙ্গুরতর এক কাঠামোতে রূপান্তরিত হবে।

পাঠক! ভেবে দেখুন, কুরআন-সুন্নাহর সমালোচনায় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় সমালোচনার মানদণ্ডকে প্রয়োগ করে যদি মুসলিমরা তাদের পরম্পরাগত বিদ্যা ও তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের সমালোচনা করে তাহলে তাদের ঐতিহাসিক শাস্ত্রসমূহের ও পবিত্র গ্রন্থসমূহের কী শক্তি অবশিষ্ট থাকবে? কী-ইবা টিকে থাকবে তাতে?

পাঠক! ভেবে দেখুন, আমাদের পণ্ডিতজনদের ও ইতিহাসের সমালোচনায় জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনার যে নীতি বা মানদণ্ড অনুসরণের দাবি তারা করেন তা যদি মুসলিমরা প্রয়োগ করেন পশ্চিমাদের পবিত্র গ্রন্থ, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাদের বিশেষজ্ঞ, নেতা ও বিজেতাদের ক্ষেত্রে, তাহলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মনীষাদের যে চিত্র তারা ফুটিয়ে তুলেছেন তার চেয়ে আরও প্রকট কদাকার ও শঙ্কাপূর্ণ চিত্র কি ফুটে উঠবে না? তাদের এই সভ্যতা-সংস্কৃতি কি পুরাতন শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে রূপান্তরিত হবে না? কিংবা এই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণভোমরা জ্ঞানীগুণীজন, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকদের কি এমন নিষ্প্রভ চিত্র ফুটে উঠবে না, যে চিত্রে তাদের মাহাত্ম্য, সুচারিত্র্য ও প্রাণময়তার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না?

অনেক সময় আমার এমন ইচ্ছা হয়, যদি আমাদের মাঝে এমন কিছু কলমযোদ্ধার আবির্ভাব ঘটতো যারা পশ্চিমের সভ্যতা ও এর বিদ্বানদের ইতিহাস সম্পর্কে লিখবে খোদ পশ্চিমাদের নীতি অনুসরণ করে। ঠিক যেভাবে তাঁরা অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক ইতিহাস ফেঁদে বসেছিলেন; যেভাবে তাঁরা গ্রন্থের মূলপাঠের বিকৃত-পাঠোদ্ধার করেছিলেন কিংবা যেভাবে তাঁরা ভালোকে খারাপে রূপান্তরিত করেছিলেন। সর্বোপরি এই কলমযোদ্ধারা যদি প্রাচ্যবিদদের যাবতীয় ভালো কাজের ব্যাপারে জনমনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করতো। (আর এমনটা যদিইবা কখনো হয়) তাহলে তাদের সভ্যতা ও মনীষাদের এমন হাস্যকর ও লজ্জাজনক চিত্র ফোঁটে উঠবে যা অন্যদের পূর্বে তাঁদের নিজেদেরই অপ্রীতিকর ঠেকবে। ভাবুন তো একবার আমাদের কেউ যদি খোদ প্রাচ্যবিদদের বোঝানোর জন্য উপর্যুক্ত পন্থায় (যা এইমাত্র

আমরা উপরে বলেছি) তাদের সমালোচনা-নীতি প্রয়োগ করে তাদের প্রকৃত রূপ এবং তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতার চিত্র ফুঁটিয়ে তোলার গুরুদায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাঁরা তখন বুঝতে পারবে আমাদের ধর্ম ও ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে নীতি প্রয়োগের দাবি তারা করেছিলেন তা কীভাবে তাদের জন্য আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। খুব সম্ভবত তারপর তারা তাদের বিকৃতকরণ, পথভ্রষ্টকরণ ও ধ্বংসাত্মক কাজে বহাল থাকতে লজ্জাবোধ করবেন।

যাই হোক, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সেই সময় বিগত হয়ে গেছে অনেক আগেই যখন আমরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ব্যাপারে জানার জন্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শরণাপন্ন হতাম। অথচ আমাদের গ্রন্থাদিই ছিল তাদের একমাত্র রেফারেন্স গ্রন্থ। যদিও আমরা এই ব্যাপারে ইতোপূর্বে অবগত ছিলাম না। তবে এখন সময় এসেছে উৎসগ্রন্থের ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতার কলঙ্ক-তিলক মুছে ফেলার। সময় এসেছে আমাদের উৎসগ্রন্থকে বোঝার জন্য আমাদের ভাষা সম্পর্কে অর্বাচীন ও অদক্ষ লোকদের বোধ বা পাঠোদ্ধারের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার মতো অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার। সময় এসেছে চরমভাবাপন্ন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ইচ্ছামতে আমাদের ধর্ম ও পণ্ডিতজনদের ব্যাপারে সন্দেহ ও কুধারণায় বিশ্বাসী না হয়ে আমাদের ধর্ম ও পণ্ডিতজনদের ওপর বিশ্বাসকে পুনর্নির্মাণ করার। আর এটা করতে হবে আমাদের মাটিচাপা দেয়া জ্ঞানভাণ্ডারের যা কিছু আমরা ধূলিমুক্ত ও সম্প্রচারিত করতে পেরেছি তা দিয়ে এবং যে মহান চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ দিয়ে আমাদের মন পরিপূর্ণ তার মাধ্যমে।

এরপরও কেউ যদি আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের অভিমত ও চিন্তা-চেতনাকে ইতিবাচক মনে করে থাকেন তাহলে তিনি চাইলে আরও সবিস্তারে জানার জন্য আমার গ্রন্থ 'ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহর ভূমিকা' প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অভিমতগুলোর বিপক্ষে আমার বাহাসটা পড়ে নিতে পারেন। এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ যেগুলো তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশোন্মোচন করেছে সেগুলোও পড়া যেতে পারে। তাহলেই তাদের বাস্তবতা বের হয়ে আসবে যেটা তাদের প্রকৃত চেহারা এবং যে চেহারার অধিকারী তারা নিজেরাই হতে চেয়েছিলেন।

গোল্ডজিহেরের মতো সত্য বিকৃতকারী ও বিভ্রান্তকারী প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রতি আমাদের কঠোরতার অর্থ এই নয় যে, তাদের মধ্যে ইনসাফকারীদের সত্যান্বেষণের নীতি-পদ্ধতি এবং আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে সুভাষণ প্রচারকে তুচ্ছজ্ঞান করছি। তাছাড়া জ্ঞান কোনো একক সম্প্রদায়ের গচ্ছিত সম্পদ নয়।

মোদ্দাকথা, ইসলাম হলো সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। ইসলামকে অনুধাবন বা বোঝা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। তাই ইসলামকে যার যেভাবে খুশি বুঝুন। তবে শর্ত হলো বিশেষজ্ঞদের ইনসাফ ও সত্যের প্রতি আন্তরিকতা এবং চরমভাবাপন্নতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

স। মা। প্ত

পৃথিবীতে পশ্চিমের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার বলয়কে মজবুত করার একটি প্রকল্প হলো প্রাচ্যতত্ত্ব বা ওরিয়েন্টালিজম। সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এই তত্ত্বের মাধ্যমে পশ্চিমের মানসিক-দাসে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী নামক গ্রহে এখন তাই যারা বাস করেন তারা হয়তো পশ্চিম নয়তো পশ্চিমেতর। এই দুইয়ের বাইরে প্রাচ্যের কোনো সম্মানজনক অস্তিত্ব পশ্চিমের কাছে নেই। প্রাচ্যের সত্য ও তথ্যকে বিকৃত করে সারা পৃথিবীতে প্রাচ্যকে অবান্তর আস্তিত্বের অধিকারী বানানো হয়েছে।

ওরিয়েন্টালিজম ইসলাম ও মুসলিম-সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানপরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন মুসলিম ইসলামকে কেমন করে দেখবে সেটাও সে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন অমুসলিম ইসলাম নিয়ে কী ভাববে, সেটা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও তার কাঁধেই। পশ্চিম শব্দটি তাই এখন আর কোনো অঞ্চলভিত্তিক ভৌগলিক পরিচয় প্রদান করে না। এখন এটি একটি আদর্শিক পরিচয়। এই আধিপত্যবাদী নারকীয় আর্দশকে বুঝতে হলে ওরিয়েন্টালিজমকে জানা আবশ্যক। বর্তমান পৃথিবীকে বোঝা তখন আমাদের জন্য সহজ হবে। কারণ প্রাচ্যতত্ত্বের হাত ধরেই পরবর্তী পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে বিপুল বির্পযয়। ইসলামোফোবিয়া তার একটি।

ড. মুস্তফা সিবাঈ ওরিয়েন্টালিজমের এই সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক পরিচয়কে আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন সহজ ও সাবলীল বর্ণনায়। মোচন করেছেন আমাদের জ্ঞান জগতের অবারিত অন্ধকার। তাই বলা যায়, সিবাঈ'র এই বই বাংলা ভাষায় এক অনন্য ও অপরিহার্য সংযোজন।